

বাংলাদেশে শিশুশ্রম : একটি বাস্তবতা

মুহঃ মিজানুর রহমান*

Abstract : *Balanced growth and development of children, the most potential section of population of any country for building a prosperous nation, is very essential to be the country's promising citizens in the future. This notion is not only applicable for the developing countries but also for developed countries of the world. The children need to be brought up with an adequate love and care by the parents and family members, resources of family and the state, rights and privileges to be ensured by the society, appropriate plans and programmes to be undertaken by the state etc. for their appropriate development. But a huge number of children in the third world countries like Bangladesh are engaged either willingly or forcefully in such fields of labour which are risky and harmful for their balanced growth and development. Their family resources and efforts cannot meet their basic needs. The Government and both the local and international NGOs working in the country have undertaken several initiatives to eliminate childlabour. The prevailing socio-economic, cultural, political and even the natural situations are not favourable to fulfil the children's needs and demands. The reality compels them to sell their labour in childhood with a nominal wage rate. The present paper attempted to picturize the hard realities of childlabour prevailing in the country, which have to be offset by any means for building Bangladesh as a prosperous nation.*

ভূমিকা

শ্রম একটি ইতিবাচক ধারণা হলেও শিশুশ্রম সেই গুরুত্ব বহন করে না। অপরিণত বয়সে এই শ্রম শিশুর শারীরিক, মানসিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক বৃদ্ধি ও বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে থাকে। শিশুর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে বিনাশ করে দেয় এবং শিশুর সুপ্ত প্রতিভার বিকাশে

* সহকারী অধ্যাপক, সমাজকর্ম বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।

অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। সর্বোপরি এই শ্রম শিশুকে ভবিষ্যৎ যোগ্য ও দক্ষ নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে থাকে। এ কারণে বিশ্বব্যাপী শিশুশ্রম একটি প্রচণ্ড উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমান বিশ্বে উন্নত, স্বল্পোন্নত, ছোট-বড় প্রায় প্রতিটি দেশে শিশুশ্রম সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সমস্যার রূপ নিয়েছে এবং রাষ্ট্রীয় জীবন থেকে শুরু করে সামাজিক জীবন এমন কি ব্যক্তিগত জীবনেও এ সমস্যার ব্যাপক কুপ্রভাব লক্ষণীয়। বাংলাদেশও এ সমস্যা থেকে মুক্ত নয়। এদেশের নাজুক আর্থ-সামাজিক অবস্থায় প্রায় সর্বক্ষেত্রে শিশুশ্রমের ব্যাপক উপস্থিতি ও বিস্তৃতি সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ জাতি গঠনে মারাত্মক সমস্যা হিসেবে সর্বমহলকে ভাবিয়ে তুলেছে^১। প্রকৃতপক্ষে তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বিচিত্র রকমের শোষণ, বঞ্চনা, দারিদ্র্য এবং অন্যান্য প্রতিকূল আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক অবস্থার কারণে এদেশে শিশুশ্রম আজ একটি নির্মম বাস্তবতা হিসেবে দেখা দিয়েছে। কেননা যে বয়সে শিশুদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিদ্যাশিক্ষা অর্জনে নিয়োজিত থাকার কথা; সুস্থ সাংস্কৃতিক চর্চা ও বিনোদনের মাধ্যমে সম্ভাবনাময় নাগরিক হিসেবে বেড়ে উঠার কথা, সেই বয়সে এদেশে তারা মৌলিক চাহিদা পরিপূরণে কর্মবাস্ত থাকে। একটু তলিয়ে দেখলে একথা উপলব্ধি করা সহজ যে, শিশুবয়সে জীবনের এ করুণ পরিণতি তাদের অর্জিত নয় বরং এদেশের অধিকাংশ নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের শিশুরা এ অবস্থা পৈত্রিকভাবে পেয়ে থাকে। পরিবারের অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা ও দারিদ্র্যক্লিষ্টতা, পিতৃমাতৃহীনতা, দুঃস্থতা, অসহায়ত্ব ইত্যাদি কারণে জীবন ধারণের প্রয়োজনে শিশুরা এই বাস্তবতাকে মেনে নেয় এবং তাদের জীবনের একমাত্র সম্বল শ্রমকে নামমাত্র মূল্যে বিক্রি করে থাকে। জাতিসংঘ শিশু অধিকার সংক্রান্ত সনদে প্রত্যেক রাষ্ট্রকে তার শিশুদের মৌলিক চাহিদাপূরণ ও আইনানুগ অধিকার সংরক্ষণে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা বলা হলেও এদেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থা, উন্নয়নের শ্লথগতি, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক উদাসীনতা, অস্বচ্ছতা ইত্যাদি কারণে সরকার শিশুদের স্বার্থ সংরক্ষণে কাজ করতে ব্যর্থ হয়। পক্ষান্তরে দারিদ্র্য, উপার্জনকারী ব্যক্তির মৃত্যু, পঙ্গুত্ব বা অক্ষমতা, সম্পদের স্বল্পতাসহ নানাবিধ কারণে শিশুর কাজকে পরিবারের জন্য আবশ্যিক হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। পারিবারিক চাহিদা পূরণে শিশু তার অর্জিত আয়ের পুরোটাই পরিবারের হাতে তুলে দেয়। কায়িক শ্রমের মাধ্যমে শিশুর অর্জিত এ আয় পরিবারের দুরবস্থা দূরীকরণ, অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা ফিরিয়ে আনতে এবং দুঃখ দুর্দশা লাগবে কিছুটা হলেও অবদান রাখে। সুতরাং শিশুশ্রম শিশুর উন্নয়ন ও বিকাশের অন্তরায় হলেও এদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার রূঢ় বাস্তবতা শিশুদেরকে এরূপ অবাঞ্ছিত শ্রমে নিয়োজিত করে থাকে- এ কথা নির্দিধায় বলা যায়।

শিশুশ্রম কি ?

বিশ্বায়নের এই যুগে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে শিশুরা কম বেশি শ্রমে নিয়োজিত রয়েছে। তবে সকল প্রকার শ্রম শিশুর জন্যে ক্ষতিকর নয়। বিশ্বে সমাজ ও জাতিভেদে এমন কিছু শ্রম আছে যা শিশুর শিক্ষা, চিত্তবিনোদন ও বিশ্রামে ব্যাঘাত না ঘটিয়ে তার সামগ্রিক বিকাশে সহায়ক হয়ে থাকে।^২ কিন্তু যে শ্রম শিশুর কর্মসংস্থান ও আয়ের সাথে জড়িত এবং

শিশুর সার্বিক উন্নতি ও বিকাশে অন্তরায় সৃষ্টি করে তা সন্দেহাতীতভাবে শিশুর জন্যে ক্ষতিকর- শিশুদের প্রদত্ত এরূপ শ্রমকে শিশুশ্রম হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। অর্থাৎ যে শ্রম শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশে অন্তরায় তা-ই শিশুশ্রম। শিশুশ্রমের বিভিন্ন নেতিবাচক দিক তুলে ধরে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় শিশুশ্রম কমিটি কর্তৃক এ সম্পর্কে সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা প্রদানের চেষ্টা করা হয়েছে। এই কমিটির মতে, যে কাজ শিশুর পরিপূর্ণ শারীরিক উন্নয়ন ও প্রয়োজনীয় বিনোদন ব্যবস্থায় বাধার সৃষ্টি করে তাকে শিশুশ্রম বলা যায়।^৩ তবে কোন কোন ক্ষেত্রে এই শ্রম পরিবারের ক্ষুদ্র পরিসরে সীমাবদ্ধ থাকে যা শিশুদের সুষ্ঠু দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও সামাজিক বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। আবার অনেক ক্ষেত্রে তা শিশুদের পরিবারের উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথকেও প্রসারিত করে থাকে।^৪ অর্থাৎ সবক্ষেত্রে শিশুর কাজকে ক্ষতিকর বলে মনে করা হয় না। পরিশ্রমের মাত্রার উপর ভিত্তি করেই শিশুশ্রমকে ক্ষতিকর বলে চিহ্নিত করা হয়। যে সমাজে দারিদ্র্য, অসমতা, সম্পদের স্বল্পতাসহ বিভিন্ন প্রকার প্রতিকূল আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিরাজমান, সেখানে শিশুশ্রমের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে। এরূপ শ্রমে শিশুদের অর্থনৈতিক আয়ের বিষয়টি মুখ্য হয়ে থাকে এবং অনেক ক্ষেত্রে তা শিশুর জন্যে বিপজ্জনক ও শোষণমূলক হতে পারে। প্রায় এক দশক আগে ইউনেসফ এই শোষণমূলক শিশুশ্রমের ক্ষেত্রে কিছু বিষয় নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। এগুলো হচ্ছে- ক) অল্প বয়সে পূর্ণকালীন কাজ, খ) খুব দীর্ঘ সময় কাজ, গ) এমন কাজ যা অহেতুক দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক চাপ সৃষ্টি করে থাকে, ঘ) রাস্তাঘাটে কাজ বা জীবনযাপন, ঙ) অপরাধপূর্ণ পারিশ্রমিক, চ) খুব বেশি দায়িত্ব, ছ) যে কাজ শিক্ষা লাভের সুযোগকে ব্যাহত করে, জ) যে কাজ শিশুর মর্যাদা ও আত্মসম্মানকে হেয় করে, ঝ) যে কাজ শিশুর পরিপূর্ণ দৈহিক, সামাজিক ও মানসিক বিকাশের পরিপন্থী ইত্যাদি। অন্যভাবে বলা যেতে পারে, শিশুশ্রম হলো এক প্রকার অর্থনৈতিক অনুশীলন যা সমাজের উন্নতির বদলে সামাজিক ক্ষতির সঙ্গে সহাবস্থান করে। অর্থনৈতিক অনুশীলন হিসেবে এ ধরনের শ্রম শিশুর কর্মসংস্থানের সাথে জড়িত যার দ্বারা শিশু অর্থ উপার্জন করে এবং পারিবারিক আয়ের সাথে তার অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করে থাকে।^৫ অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিশু এ অর্থ কায়িক শ্রমের মাধ্যমে অর্জন করে এবং উপার্জিত অর্থের প্রায় পুরোটাই তার পরিবারের দারিদ্র্য, অস্বচ্ছলতাসহ প্রতিকূল আর্থ-সামাজিক অবস্থা দূরীকরণে বৈষয়িক সাহায্য হিসেবে প্রদান করে থাকে। উল্লেখ্য যে, এমন অনেক শিশুশ্রম আছে যার সাথে অর্থোপার্জন সম্পৃক্ত নয়। এজাতীয় শ্রম শিশুদের সাধারণত জীবিকা নির্বাহের পাথেয় হিসেবে কাজ করে থাকে। আবার এমন অনেক শিশুশ্রম আছে যার সাথে অর্থোপার্জন কিংবা জীবিকার সংস্থান কোনটাই জড়িত থাকে না। এক্ষেত্রে পারিবারিক প্রয়োজনই শিশুর এ ধরনের শ্রম প্রদানে মুখ্য নির্ধারক হিসেবে কাজ করে থাকে। অতএব শিশুশ্রমের সাথে অর্থোপার্জন বা অনুসংস্থান বা পারিবারিক প্রয়োজন যা-ই জড়িত থাকুক না কেন যে শ্রম শিশুর শারীরিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে অন্তরায় সৃষ্টি করে তাকে শিশুশ্রম হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়।

বর্তমান বিশ্বে শিশুশ্রম একটি বহুল আলোচিত, স্পর্শকাতর ও আবেগপূর্ণ বিষয় যা কোন সমাজের জন্যে কাম্য নয়।^৬ কেননা সাম্প্রতিককালে শিশুশ্রম নিয়ে কল্যাণকামীদের

উদ্বিগ্নের প্রধান কারণ হলো শিশুদের বয়স। যে বয়সে শিশুদের বিদ্যাচর্চা, খেলাধুলা ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত থাকার কথা, সেই বয়সে শ্রমজীবী শিশুরা বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে কায়িকশ্রম প্রদানের মাধ্যমে জীবিকা অর্জনে ব্যস্ত থাকে। অপরিশ্রুত বয়সে এরূপ শ্রম সমাজের সবচেয়ে বড় সম্ভাবনাময় অংশ শিশুদেরকে পশ্চাৎপদতার শৃংখলে আবদ্ধ রাখে। তারা আগামী দিনের জন্য প্রতিশ্রুতিশীল প্রজন্ম হিসেবে গড়ে উঠতে পারে না। এক কথায়, অল্প বয়সে শ্রমজীবী শিশুরা শরীরের সাথে প্রায় অনুপযোগী শ্রমে নিয়োজিত থাকার ফলে তারা ভবিষ্যৎ সমাজের অপাত্তেয় শ্রেণী হিসেবে বেড়ে ওঠে। তবে শিশুশ্রমিকদের বয়স সীমা ও কাজের ধরন সমাজ ও রাষ্ট্রভেদে ভিন্ন হতে পারে।^১ অনেক দেশে হালকা ও বিপজ্জনক কাজের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা হয়েছে। এসব দেশে হালকা কাজের জন্য বয়স সীমা ১২ বছর এবং বিপজ্জনক কাজের জন্য ১৬ থেকে ১৮ বছর ধরা হয়েছে।^২ বিভিন্ন দেশে কাজের ধরন অনুযায়ী বয়সের ভিন্নতা থাকলেও প্রায় সকল দেশেই শিশুশ্রম একটি নেতিবাচক ধারণায় পরিণত হয়েছে এবং সকল প্রকার শ্রম শিশুর শারীরিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বৃদ্ধি ও বিকাশ প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে থাকে-এ বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত।

বাংলাদেশে শিশুশ্রমের বাস্তব অবস্থা ও পরিসংখ্যান

বাংলাদেশে অধিকাংশ পরিবার অধিক জনসংখ্যা, দারিদ্র্য, ভূমিহীনতা, নিরক্ষরতা, বেকারত্ব, উপার্জনকারী ব্যক্তির মৃত্যু, পঙ্গুত্ব বা অক্ষমতা ইত্যাদি সমস্যায় জর্জরিত। তদুপরি এদেশে প্রায় প্রতি বছর কোন না কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে অসংখ্য পরিবার সহায়-সম্বল হারিয়ে নিঃশ্ব হয়ে যায়। এসব পরিবারের বিশেষ করে দরিদ্র, দুঃস্থ, এতিম, অসহায় পরিবারের শিশুরা জীবিকার প্রয়োজনে অনন্যোপায় হয়ে কর্মসংস্থানের অন্বেষণ করে থাকে। এ অবস্থায় এদেশের অধিকাংশ স্বচ্ছল পরিবার পেটে-ভাতে কখনো বা নামমাত্র পারিশ্রমিকে বিনিময়ে এসব শিশুকে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত রাখে। আবার শ্রমবাজারে শিশুশ্রমের মূল্য সাধারণত কম হওয়ায় অধিকাংশ শিল্প-কারখানা বিশেষ করে গার্মেন্টস শিল্পের মালিকেরা যৎসামান্য মজুরীর বিনিময়ে এসব শিশুকে উৎপাদনক্ষেত্রে নিয়োগ করে থাকে। এতে মালিকদের মজুরী বাবদ অর্থ কম ব্যয় হয়। আবার অপ্রাপ্ত বয়সে শিশুদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সাধারণত নরম ও কোমল থাকে। এসময় শিশুরা কাজের প্রতি কম বেশি মনোযোগী থাকে। ফলে মালিকরা নিজেদের সুবিধার্থেও তাদেরকে কাজে নিয়োজিত করতে উৎসাহবোধ করে থাকে। এ জাতীয় নানাবিধ কারণে এদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিশুশ্রমিকের উপস্থিতি ব্যাপক হারে বাড়ছে। এদেশের শিশুরা শিল্প-কারখানা থেকে শুরু করে নির্মাণকাজের মত ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্রে নিয়োজিত রয়েছে। বর্তমানে এরা পতিতাবৃত্তিতেও জড়িয়ে পড়ছে, যা বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যিক যৌনশোষণ নামে পরিচিতি লাভ করেছে। এসব পতিতালয়ে আবার জন্ম দিচ্ছে পিতৃ-পরিচয়হীন শিশু যারা ভবিষ্যৎ জীবনে দুঃস্থ, অসহায়, ছিন্নমূল কিংবা পথশিশু নামে পরিচিতি পেয়ে থাকে। জীবন ধারণের বাস্তবতায় এসব শিশুদের শ্রমে নিযুক্ত হওয়া ছাড়া আর কোন বিকল্প থাকে না।

বর্তমানে বাংলাদেশে শিশুর সংখ্যা (০-১৮ বছর) প্রায় ৫ কোটি ৬০ লাখ।^৯ এসকল শিশুর মধ্যে দরিদ্র, দুঃস্থ, এতিম, অসহায় ও পথশিশুর সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ৪২ লাখ।^{১০} এ শিশুদের প্রায় ৬৩ লাখ বিভিন্ন প্রকার শ্রমে নিয়োজিত রয়েছে যা মোট শ্রমশক্তির ১১.৭ শতাংশ।^{১১} এসব শিশুর অধিকাংশই গ্রামীণ কর্মক্ষেত্রসমূহে নিয়োজিত রয়েছে (সারণি-১)।

সারণি - ১ : বাংলাদেশে গ্রাম ও শহর ভেদে মোট শিশুশ্রমিক (শিশু শ্রম জরিপ ১৯৯৯-২০০০)

পর্যায়	মোট (হাজারে)	ছেলে	মেয়ে
জাতীয়	৬৩০২	৩৭৬০	২৫৪২
গ্রাম	৫১৬১	৩১১১	২০৫০
শহর	১১৪১	০৬৪৮	৪৯৩

সূত্র: Statistical pocket Book 2000, p 160

গ্রাম ও শহর নির্বিশেষে শিশুশ্রমিকেরা গৃহভৃত্য, কারিগরি, প্রশাসনিক, শিল্প উৎপাদন, পরিবহন, ক্রয়-বিক্রয়, কৃষি, বনজ, মৎস্য, অফিসসহ নানাবিধ কাজে নিয়োজিত থাকলেও কৃষি, বনজ, মৎস্য, উৎপাদন, পরিবহন এবং সেবামূলক কাজে তুলনামূলকভাবে বেশি নিয়োজিত রয়েছে। আবার এই হার প্রাতিষ্ঠানিক খাতের তুলনায় অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে বেশি (সারণি-২, ৩ ও ৪)।

সারণি - ২ : বৃত্তি অনুযায়ী ১০-১৪ বছরের শিশুশ্রমিকের শতকরা হার, ১৯৯৯-২০০০

বৃত্তির ধরন	মোট (%)	ছেলে (%)	মেয়ে (%)
পেশাগত ও কারিগরি	০.৬	০.৫	০.৬
উৎপাদন ও পরিবহন	১৫.৪	১৫.৩	১৫.৮
করণিক	০.৫	০.৭	০.১
বিক্রয়কর্মী	৯.৯	১৫.৬	১.৪
সেবাকর্মী	৯.৬	৫.৮	১৫.১
কৃষি, বনজ, মৎস্য	৬৪.০	৬২.১	৬৭.০
প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা	০.০	০.০	০.০

সূত্র: Statistical pocket Book 2000, p 161

সারণি - ৩ : বাংলাদেশে শিল্প ভিত্তিক ১০-১৪ বছরের শিশুশ্রমিক, (১৯৯৯-২০০০)

শিল্পের ধরন	মোট (%)	ছেলে (%)	মেয়ে (%)
কৃষি	৬৪.২	৬২.২	৬৭.২
ম্যানুফ্যাকচারিং	৮.২	৯.২	৯.৮
পরিবহন ও যোগাযোগ	২.৬	৪.২	০.২
অন্যান্য সেবা	১৪.৪	২১.৫	৩.৯
গৃহভৃত্যসহ অন্যান্য কাজ	১০.৬	৪.৯	১৯.০

সূত্র: Statistical pocket Book 2000, p 161

সারণি - ৪ : বাংলাদেশে শিল্প ভিত্তিক ১০-১৪ বছরের শিশুশ্রমিক, ১৯৯৯-২০০০)

খাত	মোট (%)	ছেলে (%)	মেয়ে (%)
প্রাতিষ্ঠানিক	৯.৯	১২.০	৬.৯
অপ্রাতিষ্ঠানিক	৯০.১	৪৪.০	৯৩.১

সূত্র: Statistical pocket Book 2000, p 161

এদেশে শিশুশ্রমিকের হার শহরের তুলনায় পল্লী অঞ্চলে অধিক। বর্তমানে শহরাঞ্চলেও এ সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। শিশুশ্রমের ক্ষেত্রে মেয়েদের উপস্থিতি আগে কম পরিলক্ষিত হলেও বর্তমান এই হার উদ্বেগজনকভাবে বাড়ছে। কৃষি, কারিগরী এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিশুশ্রমিক হিসেবে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের উপস্থিতি অনেক বেশি। আবার এ সকল শিশুশ্রমিকের অধিকাংশই গার্মেন্টস শিল্পে নিয়োজিত রয়েছে। বর্তমানে এ শিল্পে নিয়োজিত শিশুশ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ১৫ লক্ষ। তন্মধ্যে অধিকাংশই মহিলা (প্রায় ৭০%)।^{১২}

বাংলাদেশে শিশুশ্রমিকদের শ্রম প্রদানের ক্ষেত্রসমূহ

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক প্রেক্ষাপটে শিশুরা নানাবিধ শ্রমক্ষেত্রে নিয়োজিত রয়েছে। এসব ক্ষেত্রের মধ্যে কৃষি, শিল্প, নির্মাণ, গৃহকর্ম, উৎপাদন, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। শ্রমশক্তি জরিপ ১৯৯৯-২০০০ এর হিসাব অনুযায়ী, এদেশে বিভিন্ন পেশায় প্রায় ৫.৮১ কোটি শ্রম শক্তি নিয়োজিত রয়েছে যার মধ্যে ৩.৬১ কোটি পুরুষ এবং ২.১৯ কোটি মহিলা। মোট শ্রমশক্তির মধ্যে আবার ৬৩ লাখ শিশুশ্রমিক। তন্মধ্যে ছেলে ৩৭.৬ লাখ এবং মেয়ে ২৫.৪২ লাখ। আবার এ সংখ্যা শহর পর্যায়ে ১১.৪১ লাখ এবং গ্রাম পর্যায়ে ৫১.৬১ লাখ।^{১৩} এসব শিশুর অধিকাংশই গ্রাম ও

শহরের কৃষি, বনজ, মৎস্য, খনিজ, ম্যানুফ্যাকচারিং, নির্মাণ, হোটেল ও রেস্তোরাঁ, পরিবহন ও যোগাযোগ ইত্যাদি শ্রমক্ষেত্রে নিয়োজিত রয়েছে। (সারণি-৫)

সারণি - ৫ : বাংলাদেশে খাতওয়ারী শিশুশ্রমিকের শতকরা হার

খাত	১৯৯৫-৯৬ (%)	১৯৯৯-২০০০ (%)
কৃষি, বনজ, মৎস্য	৬৩.২	৬২.৩
খনিজ ও লবণ	-	০.৭
ম্যানুফ্যাকচারিং	৭.৫	৭.৪
বিদ্যুৎ গ্যাস পানি	০.২	০.২
নির্মাণ	১.৮	২.১
বাণিজ্যিক হোটেল, রেস্তোরাঁ	১.২	১২.০
পরিবহন সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	৪.২	৪.৬
অর্থব্যবস্থা ও সেবাসমূহ	০.৪	০.৭
পণ্য ও ব্যক্তিগত সেবাসমূহ	৯.৩	১০.০
অন্যান্য	২.২	০

সূত্র: বিবিএস লেবার ফোর্স সার্ভে ১৯৯৯-২০০০

উল্লিখিত ক্ষেত্রগুলো ছাড়াও এদেশে দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান বহুক্ষেত্রে অসংখ্য শিশু শ্রমে নিয়োজিত রয়েছে। বিগত ১৯৯৭ সালে আই এল ও (ওখঙ) কর্তৃক এদেশের মেট্রোপলিটন শহরের ১৬,৩৩৭ জন শিশুশ্রমিক, পুরাতন জেলা শহরের ৬,৫৬১ জন, নতুন জেলা শহরের ৬,৫০৯ জন, থানা হেড কোয়ার্টারের ১,৩৪৪ জন, গ্রামীণ এলাকার ৫,২৮৮ জন, উপজাতি এলাকার ২৪৮ জন এবং মেট্রোপলিটন এলাকার (রাতে কাজ) ৪৬৩ জন সর্বমোট ৩৮,২১৫ জন শিশুশ্রমিকের উপর পরিচালিত এক জরিপ গবেষণা থেকে দেখা যায়, এদেশে শ্রমে নিয়োজিত শিশুরা অর্থনৈতিক শ্রেণীকরণের ভিত্তিতে মেট্রোপলিটন এলাকায় ৩০০ ধরনের শ্রমক্ষেত্রে, পুরাতন জেলা শহরে ৭ ধরনের, নতুন জেলা শহরে ৭ ধরনের, থানা হেডকোয়ার্টারে ৮ ধরনের, উপজাতীয় এলাকায় ২২ ধরনের এবং গ্রামীণ এলাকায় ৯৫ ধরনের শ্রমক্ষেত্রে নিয়োজিত থাকলেও শহর-গ্রাম-জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে শিশুরা ১৮ ধরনের শ্রমক্ষেত্রে নিয়োজিত রয়েছে। তন্মধ্যে বিভিন্ন জিনিসপত্র বিক্রেতা বা বিক্রেতার সহকারী হিসেবে প্রায় ৪৪%, ফ্যাক্টরী শ্রমিক হিসেবে ১৫% এবং কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ১৩%, টোকাই ৬.৯১%, গৃহকর্মে ২.৮৯%, কুলি সংশ্লিষ্ট কাজে ৬%, পরিবহনে ২.২২%, মেরামত সংক্রান্ত কাজে ২.২৭%, নির্মাণ সংশ্লিষ্ট কাজে ৫.৭২%, মাছধরা ও প্রক্রিয়াজাতকরণে ০.৬৫%, ভিক্ষুক বা ভিক্ষুকের সহকারী হিসেবে ০.৪৪%,

পতিতা হিসেবে ০.৩২%, অফিস পিয়ন বা দারোয়ান সংশ্লিষ্ট কাজে ০.২৬%, ক্লিনার ও সুইপার হিসেবে ০.২৮% শিশু নিয়োজিত রয়েছে (সারণি-৬)।^{১৪}

সারণি - ৬ : অর্থনৈতিকভাবে শিশুদের শ্রম প্রদানের ক্ষেত্রসমূহ (শতকরা হার)

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ধরন	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	মোট (%)
বিক্রেতা, ভেভার বা বিক্রেতার সহকারী (দোকান, হোটেল ইত্যাদি)	২৭.৫৪	১.৩৬	২২.৯২
বিক্রেতা বা বিক্রেতার সহকারী (অস্থায়ী ক্ষেত্রে)	২৪.৪১	৩.৯১	২০.৭৯
ফ্যাক্টরী কর্মী (টেকনিক্যাল) গার্মেন্টস, ওয়েলডিং, লেদ ইত্যাদি	১০.৩২	০.৮০	৮.৬৪
ফ্যাক্টরী কর্মী (নন-টেকনিক্যাল) কার্পেন্টার, বেকারী ইত্যাদি	৬.৮৩	১০.৪২	৭.৪৬
নিজের বা অন্যের কাজ (কৃষি সংশ্লিষ্ট)	২.৮৬	২৯.৯৯	৭.৬৫
টোকাই বা ভ্যানগাড়ী চালক	৬.০১	১১.১০	৬.৯১
ইট বা পাথর ভাংগা ও অন্যান্য নির্মাণ সংশ্লিষ্ট কাজ	৩.৪৫	১৬.৩০	৫.৭২
কৃষিকাজ ও পশুপালন	৫.০৯	৩.২৯	৪.৭৭
কুলি (মিস্তি)	৩.৮৬	০.৪৩	৩.২৫
গৃহকর্ম	০.৭৬	১২.৮৩	২.৮৯
মার্কেট বা অন্যান্য স্থানে বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী বহন	২.৩৮	৩.৩৭	২.৫৬
হস্তশিল্পজাত বা নন-টেকনিক্যাল দ্রব্যসামগ্রী তৈরী বা মেরামত	২.৪২	১.৫৭	২.২৭
পরিবহন কর্মী (নৌকা, রিক্সা, বাস, ট্রাক, টেম্পু ইত্যাদি)	২.৬৮	০.০৮	২.২২
মাছ ধরা বা প্রক্রিয়াজাতকরণ	০.৫৮	০.৯৭	০.৬৫
ভিক্ষুক বা ভিক্ষুকের সহকারী	০.৩১	১.০৮	০.৪৪
শিশুপতিভাবৃত্তি	০.০০	১.৮২	০.৩২
ক্লিনার বা সুইপার	০.২০	০.৬৫	০.২৮
অফিস পিয়ন, নিরাপত্তাকর্মী, গৃহশিক্ষক, অভিনেতা ইত্যাদি	০.৩০	০.০৩	০.২৬
সর্বমোট	৮২.০৩৪	১৭.৬৬	১০০

সূত্র: Dr. Whahidur Rahman, "Child Labour Situation in Bangladesh: A Rapid Assessment," ILO, Dhaka, 1997, p.23

১৯৯৭ সালে সিলেট মেট্রোপলিটন (বর্তমানে সিটি কর্পোরেশন) এলাকার উপর পরিচালিত এক গবেষণাকর্মে সিলেট শহরের দরিদ্র, দুঃস্থ, অসহায়, ছিন্নমূল ও পথশিশুদের বিভিন্ন প্রকার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত থাকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ সব কর্মকাণ্ডের মধ্যে ফেরিওয়ালা, শাক-শব্জি বিক্রি, ভিক্ষাবৃত্তি বা ভিক্ষুকের সহকারী, রিক্সা চালনা, হোটেলের কাজ, জুতা পালিশ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।^{১৫} এছাড়া দেশের অন্যান্য শহরেও শিশুরা নানাধরনের কাজে নিয়োজিত রয়েছে। এদেশের শিশুশ্রমিকদের শ্রম প্রদানের ক্ষেত্রগুলো শহর, গ্রাম বা কোন বিশেষ জাতিভেদে ভিন্নতা থাকলেও এ ক্ষেত্রগুলোকে অর্থনৈতিকভাবে মোটামুটি এক এবং অভিন্ন বলা যেতে পারে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে

এদেশের শহর-পল্লী উভয় স্থানে শিশুরা যে-সব কর্মক্ষেত্রে শ্রম প্রদান করে থাকে, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্রগুলো হচ্ছে-

১। হোটেল ও রেষ্টুরেন্ট

এদেশের শহর ও পল্লী উভয় স্থানে অনেক শিশু হোটেল ও রেষ্টুরেন্টে বয়ের কাজ করে থাকে। এদের বেশির ভাগই জীবিকার অনুসন্ধানে অন্যান্য এলাকা থেকে স্থানান্তরিত হয়ে আসে। সারাদিন এসকল শিশুকে বিরামহীন পরিশ্রম করতে হয়। এখানে কাজ করে তারা সামান্য বেতন পায় এবং দু'বেলা খেতে পারে মাত্র। এ ধরনের শিশুশ্রমিকের হার গ্রামের তুলনায় শরাধ্বলে বেশি পরিলক্ষিত হয়।

২। দোকানে বিক্রেতা কিংবা বিক্রেতার সহকারী

এদেশে শিশু শ্রমিকদের শ্রম প্রদানের অন্যতম ক্ষেত্র হচ্ছে বিভিন্ন প্রকার দোকানে বিক্রেতা বা বিক্রেতার সহকারী হিসেবে কাজ করা। গ্রাম ও শহরের প্রায় সকল স্থানেই শিশুদের এ জাতীয় শ্রম প্রদান দৃষ্টিগোচর হয়। এসব দোকানে শিশুদের প্রধান কাজ হচ্ছে পরিবহনে মালামাল উঠা-নামায় সাহায্য করা, মালপত্র ওজন করে দেয়া, দোকান ঝাড়ু দেয়া, কর্মচারীদের জন্য বাসা থেকে খাবার আনা ইত্যাদি। এ ধরনের কাজ শিশুরা মূলতঃ জীবিকার বিনিময়ে করলেও কোন কোন ক্ষেত্রে এদের সামান্য বেতনও দেয়া হয়।

৩। ফেরীওয়ালা

এদেশের প্রায় সর্বত্র অনেক শিশুকে পেপার, সিগারেট, পান, চা, আইসক্রীম, ফুল ইত্যাদি দ্রব্যসামগ্রী ফেরী করতে দেখা যায়। এভাবে তারা সারাদিন পরিশ্রমের মাধ্যমে সামান্য আয় করে থাকে।

৪। গার্মেন্টস ও কারখানা

এদেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিশু গার্মেন্টস, নির্মাণ, ওয়ার্কশপ, মটর মেকানিক্সসহ বিভিন্ন প্রকার শিল্পে নিয়োজিত রয়েছে। এসব কাজ শিশুর জীবনের জন্যে ঝুঁকিপূর্ণ হলেও একটু বেশি উপার্জনের আশায় তারা এ ধরনের শ্রমক্ষেত্রে বেছে নিয়ে থাকে। এজাতীয় কাজের দ্বারা শিশুর আয় বৃদ্ধি পেলেও কর্মপরিবেশ শিশুর সার্বিক বিকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে থাকে।

৫। কৃষিক্ষেত্রে

কৃষিই হচ্ছে এদেশের শিশুশ্রমিকদের শ্রম প্রদানের সবচেয়ে বড় ক্ষেত্র। চারা রোপণ ও জমি চাষ থেকে শুরু করে এরা কৃষিকাজের প্রতিটি স্তরে শ্রম প্রদান করে থাকে। এজাতীয় কাজে শিশুদের পারিশ্রমিকের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে অনেক কম। এদেশে এমন অনেক শিশু রয়েছে যারা পারিবারিক প্রয়োজনে কৃষিকাজে নিযুক্ত হয়। এদের সংখ্যাও কম নয়।

৬। মাছ ধরা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ

নদীমাতৃক বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ মৎস্য চাষ, মাছধরা, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিক্রি ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। এ ধরনের বৃত্তি সর্বদা ঝুঁকিপূর্ণ ও কষ্টসাধ্য হয়ে থাকে। তাছাড়া একাধিক লোকবলের প্রয়োজন হওয়ায় এজাতীয় কাজে শিশুরা পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরকে সাহায্য করে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে তারা নিজেরাই এ ধরনের বৃত্তির মাধ্যমে অর্থোপার্জন করে থাকে। এদেশের দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের অধিকাংশ চিংড়ি ঘেরগুলোতে শিশুদের এজাতীয় শ্রম প্রদান বেশি দৃষ্টিগোচর হয়। এ ধরনের কাজ শিশুর জীবনের জন্যে খুবই ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে থাকে। তবুও তারা সামান্য আয়ের আশায় এ অমানুষিক শ্রম প্রদান করে থাকে।

৭। গৃহভূত্য হিসেবে কাজ

এদেশের অধিকাংশ মধ্যবিত্ত ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোতে গৃহভূত্য হিসেবে শিশুদের নিয়োগ করা হয়। এ কাজে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের এবং অপেক্ষাকৃত ছোট শিশুদের নিয়োগে প্রাধান্য দেয়া হয়। কারণ এদেরকে নিয়ন্ত্রণ করা অপেক্ষাকৃত সহজতর হয়। এখানে শিশুরা ঘর মোছা, মাছ তরকারী কাটা, ছোট-খাটো বাজার করা, থালাবাসন পরিষ্কার করাসহ নানা প্রকার কাজের সাথে জড়িত থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে এরা কাজের বিনিময়ে যৎসামান্য মজুরী পায়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরা পেটে-ভাতে কাজ করে থাকে। গ্রামের দরিদ্র পরিবারের এবং শহর এলাকার বস্তিবাসী শিশুরা এ ধরনের কাজে বেশি নিয়োজিত রয়েছে।

৮। কুলির কাজ

এদেশের অধিকাংশ দুঃস্থ, অসহায়, ছিন্নমূল ও পথশিশুদের শেষ আশ্রয়স্থল হচ্ছে ট্রেন ও বাস স্টেশন। এসব স্টেশনে এজাতীয় শিশুরা সাধারণত কুলি হিসেবে কাজ করে থাকে। এছাড়া বিভিন্ন মার্কেট, অফিস-আদালতেও এরা কুলি হিসেবে কাজ করে থাকে। এসব কাজে তাদের আয় তুলনামূলকভাবে একটু বেশি।

৯। নির্মাণ সংশ্লিষ্ট কাজ

বর্তমানে এদেশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিশু ইট ও পাথর ভাঙ্গার মত ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত রয়েছে। গ্রামের তুলনায় শহরের নির্মাণ শিল্পগুলোতে এজাতীয় শিশুশ্রমিকদের উপস্থিতি অধিক। এসব কাজ অপেক্ষাকৃত কষ্টসাধ্য হওয়ায় শিশুদের দৈহিক ও মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং অনেক ক্ষেত্রে এরা নানা প্রকার দুর্ঘটনারও শিকার হয়।

১০। খেয়া পারাপার

এদেশের নদীবহুল এলাকায় বিশেষ করে যেখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুন্নত এবং যেখানে পর্যাপ্ত সংখ্যক ব্রিজ, কার্লভার্ট ইত্যাদি নেই, সেখানে অনেক শিশু নৌকা দিয়ে খেয়া পারাপারের কাজ করে থাকে। এই কাজ তাদের শরীরের জন্যে অনেক সময় অসহনীয় হয়ে ওঠে। তবুও পারিবারিক অস্বচ্ছলতা এবং জীবিকার অন্বেষণে তারা এ ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্রে কাজ করে থাকে।

১১। রিকশা চালানো

বর্তমানে এদেশের শহরগুলোতে অসংখ্য শিশু রিক্সাচালনায় নিয়োজিত রয়েছে। এসব শিশুদের অধিকাংশই নিম্নবিত্ত পরিবার বিশেষ করে চরম দরিদ্র, দুঃস্থ, অসহায় পরিবার থেকে আসে। এদেশের গ্রামীণ ও শহর সমষ্টিতে এমন অনেক শিশু শ্রমিক রয়েছে যারা বেকারত্বের কারণে কিংবা একটু বেশি উপার্জনের আশায় এজাতীয় শ্রমে নিয়োজিত হয়। এছাড়া এদেশের প্রায় প্রতিবছর বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, নদীভাঙ্গন, খরা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে অনেক পরিবার জীবিকার অন্বেষণে শহরমুখী হয়ে থাকে। এখানে কর্মসংস্থান সংকট থাকলেও রিক্সা চালনার কাজ পাওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। ফলে শহর জীবনের কঠিন বাস্তবতায় এসব পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে শিশুরাও রিক্সাচালনাকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করে থাকে। এ কাজে দৈনন্দিন আয় তুলনামূলকভাবে একটু বেশি হলেও কর্মশক্তির ব্যয় অনেক বেশি হয়। অপরিশ্রুত বয়সে এই কঠোর পরিশ্রম শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশকে ব্যাহত করে থাকে।

১২। বাস, ট্রাক ও টেম্পু হেলপার

এদেশের অধিকাংশ বাস, ট্রাক ও টেম্পুতে হেলপার বা চালকের সহকারী হিসেবে শিশুদের উপস্থিতি লক্ষণীয়। এখানে তারা যাত্রীদের থেকে ভাড়া সংগ্রহ, গাড়ীতে মালামাল উঠানামা ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত থাকে। সাধারণত কম পরিশ্রমে একটু বেশি আয় হওয়ার কারণে এ জাতীয় ক্ষেত্রে তাদের কাছে সর্বদা আকর্ষণীয় হয়ে থাকে।

১৩। মুচি ও জুতা পালিশের কাজ

এদেশের প্রায় প্রতিটি শহরে রাস্তার পার্শ্বে কিংবা অফিস-আদালতের সামনে শিশুদের এ ধরনের কাজে নিয়োজিত থাকতে দেখা যায়। তারা কখনো কখনো রাস্তায় ঘুরে এ কাজ করে থাকে। পারিবারিক পেশা হিসেবেও অনেক শিশু এ ধরনের কাজে নিয়োজিত থাকে।

১৪। ভিক্ষুক ও ভিক্ষুকের সহকারী

বর্তমানে দরিদ্র, দুঃস্থ, এতিম, অসহায়, পথশিশুদের কাছে জীবিকা অর্জনের আকর্ষণীয় বৃত্তি হচ্ছে ভিক্ষা করা বা ভিক্ষুকের সহকারী হিসেবে কাজ করা। এদেশের অধিকাংশ হাটে-বাজারে, রাস্তায়, অফিস-আদালতের সামনে কিংবা মাজারে অসংখ্য শিশুকে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত থাকতে দেখা যায়। এদের সংখ্যা গ্রামের তুলনায় শহরাঞ্চলে বেশি। এরা কখনো ছলনা করে কিংবা হাতে পায়ে ধরে সাহায্য কামনা করে থাকে। আবার কখনো এরা বয়স্ক ভিক্ষুকের সহকারী হিসেবে কাজ করে থাকে। অপেক্ষাকৃত কম পরিশ্রমে অধিক রোজগার হওয়ায় বর্তমানে এ বৃত্তিতে শিশুদের উপস্থিতি বেড়ে চলেছে। এ ধরনের কাজ শিশুদের স্থায়ীভাবে পরনির্ভরশীল ও নৈতিকভাবে দুর্বল করে দেয়। তবুও জীবন ধারণের প্রয়োজনে শিশুরা এই ধরনের অসম্মানজনক কাজে নিয়োজিত থাকে।

১৫। শিশু পতিতাবৃত্তি

বর্তমান বিশ্বে মানবজাতির জন্য অন্যতম মারাত্মক হুমকি হচ্ছে শিশুপতিতাবৃত্তি। প্রায় সমগ্রবিশ্বে সমাজ নির্বিশেষে অগণিত শিশু এ বৃত্তিতে নিয়োজিত রয়েছে। বিশেষ করে

তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এদের সংখ্যা অনেক বেশি। বাংলাদেশেও এদের সংখ্যা কম নয়। এদেশে এদের সঠিক অবস্থান ও পরিসংখ্যান নির্ণয় করা না গেলেও শহরের বিশেষ বিশেষ এলাকায় কিংবা হোটেলে এদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এরা বিশেষ করে পরিস্থিতির শিকার হয়ে কখনো বা বৃত্তি হিসেবে এ ধরনের সমাজ দ্বিকৃত কাজে নিয়োজিত হয়ে থাকে। এখানে তারা সামান্য আয় নিশ্চিত করতে পারলেও স্বাভাবিক সামাজিক জীবন থেকে বঞ্চিত থাকে। তদুপরি এরা পতিতাবৃত্তির ভয়াবহতা সম্পর্কে খুব বেশি সচেতন না থাকায় এইডসের মতো মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়ে অকালে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

উপর্যুক্ত ক্ষেত্রগুলো ছাড়াও এদেশের অনেক শিশু প্লাস্টিক কারখানায়, ধানভান্ডার মিলে কিংবা টোকাই হিসেবে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। সর্বক্ষেত্রেই এরা অমানুষিক পরিশ্রম করে বেঁচে থাকার জন্য। শ্রম ব্যতীত তাদের জীবনে মৌলিক চাহিদা পরিপূরণের কোন বিকল্প অবলম্বন থাকে না। জীবিকার অন্বেষণে এরা কখনো কখনো সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ কিংবা অপরাধ জগতের সদস্য হিসেবে পরিচিতি লাভ করে থাকে। অপরিণত বয়সে একরূপ অস্বাভাবিক জীবন কোন শিশুর কাম্য না হলেও পরিবার ও দেশের প্রতিকূল আর্থ-সামাজিক অবস্থা তাদেরকে এ নিষ্ঠুর জীবনে আবদ্ধ রাখে।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশ। বিগত বছরগুলোতে এদেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা কিছুটা উন্নত হলেও সার্বিকভাবে প্রতিকূল বলা যায়। এসব প্রতিকূল অবস্থা কিভাবে শিশুশ্রম সৃষ্টিতে সহায়তা করছে তা আলোচনা করার আগে এদেশের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, প্রাকৃতিক অবস্থার বিভিন্ন দিক আলোচনা করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশের বর্তমান ভূ-খণ্ডটি আয়তনের দিক দিয়ে পৃথিবীর তিন হাজার ভাগের একভাগ হলেও জনসংখ্যার বিচারে নবম বৃহত্তম দেশ। এদেশের মোট জনসংখ্যা ২০০১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী প্রায় ১২.৩১ মিলিয়ন।^{১৬} এদেশের সমগ্র জনগোষ্ঠীর একটা বিরাট অংশ দারিদ্রের কারণে মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে পারে না। জাতীয়ভাবে শতকরা ৪৪.৩০ জন তাদের প্রয়োজনীয় ক্যালরী গ্রহণ করতে পারে না। এদেশের দারিদ্র্য ক্রমহ্রাসমান হলেও প্রায় সকল পর্যায়ে দারিদ্র্যের উপস্থিতি ও এর বিস্তৃতি অনেক বেশি। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) পরিচালিত খানা, আয় ও ব্যয় নির্ধারণ জরিপ ২০০০ অনুযায়ী, ক্যালরী গ্রহণ পরিমাপে পল্লী জনগোষ্ঠীর প্রায় ৪২.৫ শতাংশ দারিদ্র্য সীমার নিচে এবং ১৮.৭ শতাংশ চরম দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করছে (সারণি-৭)।^{১৭}

সারণি - ৭ : ক্যালরী গ্রহণ ভিত্তিক দারিদ্র্য ও চরম দারিদ্র্য

দারিদ্র্যের ধরন	পর্যায়	১৯৯১-৯২	১৯৯৫-৯৬	২০০০
দারিদ্র্য	জাতীয়	৪৭.৫	৪৭.৫	৪৪.৩
	শহর	৪৬.৭	৪৯.৫	৫২.৫
	পল্লী	৪৭.৭	৪৭.৭	৪২.৫
চরম দারিদ্র্য	জাতীয়	২৮	২৫.১	২০.০
	শহর	২৬.৩	২৭.৩	২৫.০
	পল্লী	২৮.৩	২৪.৬	১৮.৭

সূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) খানা, আয় ও ব্যয় নির্ধারণ সংক্রান্ত প্রাথমিক প্রতিবেদন, ২০০০

ক্যালরী গ্রহণ প্রক্রিয়া ছাড়াও মৌলিক চাহিদার খরচ প্রক্রিয়া ব্যবহার করে বাংলাদেশের দারিদ্র্য পরিমাপ করার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। খানা, আয় ও ব্যয় নির্ধারণ জরিপ ২০০০ অনুযায়ী, এদেশে (জাতীয় পর্যায়ে) ৩৩.৭ শতাংশ জনগোষ্ঠী চরম দারিদ্র্য এবং ৪৯.৮ শতাংশ দারিদ্র্য অবস্থায় জীবনযাপন করছে। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) এর প্রতিবেদন অনুযায়ী পল্লী অঞ্চলে শতকরা ৫০ ভাগের বেশি লোক দরিদ্র (৫১.৭%)। এর মধ্যে চরম দরিদ্র প্রায় ২২.৫ ভাগ (সারণি-৮)।^{১৮}

সারণি - ৮ : বাংলাদেশে পল্লী অঞ্চলে দারিদ্র্য পরিবর্তন (%) ১৯৮৭-৯৪

সূচক	১৯৮৭	১৯৮৯-৯০	১৯৯৪
চরম দারিদ্র্য	২৫.৮	৩০.৭	২২.৫
দারিদ্র্য	৩১.৭	২৮.৬	২৯.২
দারিদ্র্য ও চরম দারিদ্র্য	৫৭.৫	৫৯.৩	৫১.৭
দারিদ্র্য ব্যবধান (%)	২৭.৭	২৪.৮	১৯.২

সূত্র: Dynamic of rural poverty in Bangladesh, April 1996, BIDS, Dhaka, p 61

প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশে পল্লী ও শহরাঞ্চলের ক্যালরী পরিমাপে দারিদ্র্য আগের তুলনায় হ্রাস পেলেও অধিকাংশ জনগণ তাদের জীবন ধারণের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করতে পারে না। তাছাড়া বাংলাদেশে পল্লী অঞ্চলে অসম ভূমি মালিকানা, শহর ও পল্লী অঞ্চলে আয়ের অসম বণ্টন, কর্মসংস্থানের অভাব এবং সার্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির নিম্নহার এদেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতিকে প্রতিনিয়ত প্রভাবিত করছে। ফলে পল্লী জনগণ দারিদ্র্যের প্রকোপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে শহরমুখী হচ্ছে। বসবাসের প্রয়োজনে বস্তি গড়ে তুলছে এবং বাঁচার তাগিদে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে শিশুরাও শ্রমে নিয়োজিত হচ্ছে।

অসম ভূমি বন্টন ও মালিকানা এদেশের প্রচলিত ভূমিস্বত্ব (Land Tanure System) ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। প্রচলিত ভূমি সংস্কার আইনের (Law of land Reform) কঠোর প্রয়োগ না থাকায় এদেশের স্বল্প সংখ্যক স্বচ্ছল জনগোষ্ঠী অধিকাংশ ভূমির মালিকানা দখল করে রয়েছে। আবার দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মাথাপিছু জমির পরিমাণ হ্রাসের সাথে সাথে ভূমিহীনদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৬০ সালের কৃষি শুমারী, ১৯৬৮ সালের কৃষি মাপ্তির সার্ভে, ১৯৭৪ সালে বিআইডিএস জরিপ, ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর পাইলট জরিপ এবং ১৯৭৭ সালে ইউএসএইড এর রিপোর্ট অনুযায়ী, বাংলাদেশের শতকরা ৬০ ভাগ লোক নিজস্ব জমিতে চাষাবাদ করে থাকে। ১৯৭৭ সালে এই হার শতকরা ৫৫.৬৪ ভাগে নেমে আসে। তাছাড়া ৪৪ শতাংশের বেশি মানুষ নিজের ও ভাড়া করা জমিতে চাষাবাদ করে থাকে। এদের মধ্যে অনেকেই আবার কার্যত ভূমিহীন। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের সময়ের ব্যবধানে ভূমিহীনদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে এবং কৃষকদের জমির পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে।^{১৯} জমির শ্রেণী বিন্যাস হিসেবে পল্লী অঞ্চলে ০.০৫ একর পর্যন্ত জমি ছিলো ১৮.৭৭ শতাংশ পরিবারের এবং ০.৫০ একর পর্যন্ত জমি ছিলো ৫৫.২৩ শতাংশ পরিবারের। এর মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক পরিবারের জমি ছিলো ০.০৫ হতে ০.৫০ একর পর্যন্ত। বস্তুতঃ মুষ্টিমেয় লোকের হাতে এদেশের অধিকাংশ সম্পদ ও সম্পত্তি কুক্ষিগত থাকায় ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান ধীরে ধীরে বাড়ছে (সারণি-৯)।

সারণি - ৯ : বাংলাদেশে পরিবার ভিত্তিক জমির মালিকানা (%)

আয়তন অনুসারে ভূমিমালিকানা (একর)	জাতীয়	পল্লী	শহর
ভূমিহীন	৯.৯৭	৬.৪৩	২৮.০২
০.০১-০.০৪	১৪.৫	১২.৩৪	২২.৭৮
০.০৫-০.৪৯	৩৫.১৯	৩৬.৪৬	২৮.৭১
০.৫-১.৪৯	১৯.০৩	২০.৮০	১০.০৪
১.৫০-২.৪৯	৮.৮৯	৯.৮৪	৪.০৪
২.৫০-৭.৪৯	১০.৮৮	১৯.৯৭	৫.৩৬
৭.৫০-অধিক	১.৯৮	২.১৬	১.০৮

সূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, বিবিএস, খানা, ব্যয় নির্ধারণ জরিপ ১৯৯৫-৯৬

২০০০-২০০১ অর্থ বছরে বাংলাদেশে চলতি বাজার মূল্যে জিডিপি ছিলো ২৩৩২৫৫ কোটি টাকা। জন প্রতি জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ছিলো ৫.৯৪%। বাংলাদেশে জিডিপি ও জিএনপি ১৯৯৭ সাল থেকে ক্রমান্বয়ে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু টাকার অবমূল্যায়নের কারণে ২০০১-০২ অর্থ বছরে তা কিছুটা হ্রাস পেয়েছে।^{২০} উল্লেখ্য যে এদেশে জন প্রতি

জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার বাড়লেও এর সুফল মুষ্টিমেয় স্বচ্ছল জনগোষ্ঠী ভোগ করছে। অথচ এদেশের বৃহৎ দরিদ্র জনগোষ্ঠী এর সুফল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে (সারণি-১০)।

সারণি - ১০: বিগত কয়েক বছরের জন প্রতি জিডিপি, জিএন আই (চলতি বাজার মূল্যে)

অর্থনৈতিক সূচক	১৯৯৭-৯৮	১৯৯৮-৯৯	১৯৯৯-২০০০	২০০০-০১	২০০১-০২
জিডিপি (কোটি)	২০০১৭৭	২১৯৬১৭	২৩৭৯০৮৬	২৫৩২৫৫	২৭১১২৪
জিএনআই (কোটি)	২০৬৬৭৪	২২৭২৫০	২৪৫৭৯৯	২৬২৭৯০	২৮১২৯৩
জনসংখ্যা (কোটি)	১২.৬৫	১২.৮১	১২.৯৮	১২.৯০	১৩.১২
জনপ্রতি জিডিপি (টাকা)	১৫১২৪	১৭১৫০	১৮২৭০	১৯৫৯৫	২০৬৭৩
জনপ্রতি জিএনআই (টাকা)	১৬৩৩৮	১৭৭৪০	১৮৯৪৪	২০৩৩২	২১৪৪৮
জনপ্রতি জিডিপি (মার্কিন ডলার)	৩৪৮	৩৫৭	৩৬৩	৩৬৩	৩৬২
জনপ্রতি জিএনআই (মার্কিন ডলার)	৩৬৯	৩৬৯	৩৭৭	৩৮৭	৩৭৫

সূত্র: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০২, অর্থবিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয়, ঢাকা

এদেশের জনগণের গড় মাথাপিছু আয় তাদের জীবন ধারণের জন্যে যথেষ্ট নয়। অন্যান্য দেশের তুলনায় তা নিতান্তই অপ্রতুল। প্রকৃতপক্ষে এদেশের মুষ্টিমেয় জনগোষ্ঠীর সমুদয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ফলে মোট জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। জাতীয় আয়ের এরূপ ক্রমবৃদ্ধির ফলে ধনিকশ্রেণী বা স্বচ্ছল জনগোষ্ঠীর গড় মাথাপিছু আয় উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেলেও অধিকাংশ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাথাপিছু আয়ের তেমন কোন পরিবর্তন হচ্ছে না। ফলস্বরূপ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা কিছুটা উন্নত হলেও তারা দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র (Vicious Circle of Poverty) থেকে বের হতে পারছে না (সারণি-১১)।

সারণি - ১১: বিভিন্ন দেশের মাথাপিছু গড় আয় (মার্কিন ডলার)

দেশ	মাথাপিছু জিএনপি ৯৯
বাংলাদেশ	৩৭০
ভারত	৪৫০
পাকিস্তান	৪৭০
শ্রীলংকা	৮২০
যুক্তরাষ্ট্র	৩০৬০০০
নরওয়ে	৩২৮৮০

সূত্র: The State of World Children 2001, UNICEF, p 40

শিক্ষা হচ্ছে মানুষের মৌলিক অধিকার। উন্নত জীবনযাপনের প্রয়োজনে মানুষের মূল বিনিয়োগ। এই বিনিয়োগের মাধ্যমে মানুষ ভবিষ্যৎ জীবনে সচেতনতা ও স্বনির্ভরতা অর্জন করে থাকে। কিন্তু এদেশের শিক্ষার হার ও মান অন্যান্য উন্নত দেশের তুলনায় অনেক নিচে অবস্থান করছে। একারণে বর্তমানে শিক্ষার হার ও মান উন্নয়নের পাশাপাশি মানব সম্পদ উন্নয়নে শিক্ষার প্রতি অধিক গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। এ লক্ষ্য অর্জনে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৯৭-২০০২) শিক্ষা ও ধর্ম খাতে সর্বাধিক ১২৮৬৮১.৫ মিলিয়ন টাকা বরাদ্দ দেয় হয়।^{২১} শিক্ষার হার বৃদ্ধির জন্যে এদেশে বর্তমান প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা : প্রাথমিক ও প্রাথমিকোত্তর। সরকার প্রাথমিক শিক্ষার উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করার ফলে বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের প্রবেশগম্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে দারিদ্র ও যথাযথ পূর্ণবাসনের অভাবে শিশুদের বিদ্যালয় গমনাগমন নিয়মিত করা সম্ভব হচ্ছে না। অধিকাংশ শিশু প্রাথমিকোত্তর পর্যায়ে প্রবেশের আগেই ঝরে পড়ছে। আবার শিক্ষার্থী অপেক্ষা শিক্ষকের সংখ্যা অপ্রতুল হওয়ায় শ্রেণীকক্ষে উপযুক্ত পাঠদান সম্ভব হচ্ছে না। ফলে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেলেও শিক্ষার গুণগত মানের তেমন কোন উন্নতি হচ্ছে না (সারণি-১২)।

সারণি - ১২: বাংলাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর সংখ্যা

প্রতিষ্ঠানের ধরণ	প্রতিঃ সংখ্যা	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	নারীর সংখ্যা	পুরুষের সংখ্যা	শিক্ষকের সংখ্যা
বিশ্ববিদ্যালয় (সরঃ)	১৩	৭০,১৪৫	১৬,৬৬০	৫৩,৪৮৫	৪,৩৯৩ (৯টির মধ্যে)
বিশ্ববিদ্যালয় (বেসরঃ)	১৮	৯,৩৯১	২,০২৩	৭,৩৬৮	১,১২৫
কলেজ (সরঃ)	২৭২	৪,৭৮,৬৫০	১,৭৭,২৫৭	৩,০১,৩৯৩	১১,০১৮
কলেজ (বেসরঃ)	২,০১৬	১১,৪৩,৭৬২	৪,২৩,৩৭২	৭,২০,৩৯০	৪৬,২৭৮
মাধ্যমিক বিদ্যালয় (সরঃ)	১৪,০৬৯	৬৬,৮০,০০০	৩০,৩৬,০০০	৩৬,৪৪,০০০	১,৬৯,৯৮৯
মাদ্রাসা (সরঃ ও বেসরঃ)	৭,০৯৬	২৯,৩৪,০০০	-----	-----	-----
প্রাইমারী (সরঃ ও বেসরঃ)	৬৫,৬১০	১,৯৬,১২,০০০	৯৩,৬৭,০০০	১,০২,৪৫,০০০	২,৭৮,৯৯২

সূত্র: Statistical Year Book Bangladesh 2000, Bureau of Statistics, Planning Division, Ministry of Planning

শিক্ষার সাথে কর্মসংস্থানের বিষয়টি অঙ্গাঙ্গি জড়িত। কেননা বর্তমান বিশ্বে এমন কতগুলো পেশা যেমন: শিক্ষকতা, চিকিৎসা, ওকালতি, প্রকৌশল ইত্যাদি রয়েছে, যেগুলো অনুশীলন করার জন্যে শিক্ষালব্ধ জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন। এমনিতেই এদেশে অপরিপূর্ণ কর্মসংস্থান সুযোগ-সুবিধার কারণে বেকারত্ব সংকট অনেক প্রকট। তদুপরি বৃত্তিমূলক শিক্ষা, কর্মমুখী শিক্ষা, কারিগরী শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকার কারণে বেকার সমস্যা বিশেষ করে শিক্ষিত বেকার সমস্যা মোকাবেলা করা সম্ভব হচ্ছে না। আবার গ্রাম ও শহর-উভয় পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে আংশিক বেকারত্ব, মৌসুমী বেকারত্ব, ছদ্মবেকারত্ব ইত্যাদি বিরাজমান থাকায় এ সমস্যার তীব্রতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে (সারণি-১৩)। এ সমস্যার নেতিবাচক প্রভাবে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এদেশের নিম্নবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারগুলো। গ্রাম পর্যায়ে এ জাতীয় পরিবারগুলোর প্রধান পেশা হচ্ছে কৃষি আর শহর পর্যায়ে ছোট-খাটো চাকুরী, দিনমজুর কিংবা রিক্সাচালনা। এধরনের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে

দৈনিক আয়ের পরিমাণ খুব কম হওয়ায় এ আয় দিয়ে এ পরিবারগুলো জীবনধারণের মৌলিক চাহিদাগুলো ঠিকমত পূরণ করতে পারে না। একারণে এজাতীয় পরিবারগুলো অধিক উপার্জনের প্রত্যাশায় শিশুদেরকে শিক্ষার পরিবর্তে কর্মসংস্থানে নিয়োজিত রাখে। ফলে শিশুশ্রমের বিস্তৃতিও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সারণি - ১৩: বিগত কয়েক বছরে বিভিন্ন পর্যায়ে বেকার শ্রমশক্তি (পুরুষ, মহিলা ও শিশু)

জরিপ	লিঙ্গ	সিভিলিয়ান লেবার ফোর্স (মিলি)				নন-সিভিলিয়ান লেবার ফোর্স (মিলিঃ)			
		মোট	বেকার	গ্রাম	শহর	মোট	গৃহস্থালী	কর্মহীন	শিশু (০-৯)
১৯৯০-৯১	পুরুষ	৩১.১	০.৬	০.৫	০.১	২৬.০	০.১	৭.৮	১৮.০
	মহিলা	২০.১	০.৪	০.৩	০.১	৩১.১	৯.৫	৪.৯	১৭.৫
১৯৯৫-৯৬	পুরুষ	৩৪.৭	০.৯	০.৬	০.৩	২৭.৫	০.১	৯.৫	১৭.৯
	মহিলা	২১.৩	০.৫	০.৪	০.১	৩৮.৪	১১.৯	৮.৯	১৭.৬
১৯৯৯-২০০০	পুরুষ	৩৭.৫	১.৪	০.৯	০.৫	২৯.০	০.২	৯.৯	১৮.৯
	মহিলা	২২.৮	০.৮	০.৭	০.১	৩৮.২	১২.৮	৮.৫	১৬.৯

সূত্র: Statistical Year Book Bangladesh 2000, P.54 এবং লেবার ফোর্স সার্ভে ১৯৯০-৯১, ১৯৯৫-৯৬, ১৯৯৫-৯৬, ১৯৯৯-২০০০

বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী হলেও দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারী সমাজের অবদান সঠিকভাবে বিবেচনা করা হয় না। তবে আশার কথা এই যে, নারী ও পুরুষের মধ্যে অসমতা দূর করার লক্ষ্যে সরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি যেমন : সরকারি চাকুরীর ক্ষেত্রে মহিলাকোটা ব্যবস্থার প্রচলন, প্রাইমারী শিক্ষকতায় নারীদের অধাধিকার প্রদান, ছাত্রী উপবৃত্তি, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত নারী শিক্ষা অবৈতনিক করা ইত্যাদি কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৯৭-০২) নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্যে শিশু ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন করেছে। এ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা প্রদান ও সচেতনতা সৃষ্টি করা ইত্যাদি। কিন্তু বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থায় নারী উন্নয়ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও এদেশের নাজুক অর্থনৈতিক অবস্থা, দারিদ্র্য, বেকারত্ব, কঠোর ধর্মীয় অনুশাসন, কর্মসূচির স্বল্পতা, অর্থের স্বল্পতা, প্রশাসনিক অদক্ষতা ও দুর্নীতি, রাজনৈতিক অস্থিরতা, সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও কর্মসূচির অভাব ইত্যাদি কারণে নারী ও শিশু উন্নয়ন দ্রুততর করা সম্ভব হচ্ছে না।

শিশুরা হচ্ছে দেশ ও সমাজের ভবিষ্যৎ কর্ণধার। আজকের শিশু আগামী দিনের জাতিকে বলিষ্ঠ নেতৃত্বের মাধ্যমে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নেবে- এটাই প্রত্যাশা করা হয়। কিন্তু এদেশের শিশুসমাজের বর্তমান অবস্থা আগামী প্রজন্মের জন্যে মোটেই সুখকর নয়। এদেশে শিশু সম্পর্কিত সার্বিক তথ্য পর্যালোচনা করলে সে প্রাতিষ্ঠানিক পরিষ্কৃতি হয়।

১৯৯১ সালের আদমশুমারীর রিপোর্ট অনুযায়ী, এদেশে মোট জনসংখ্যার ৪৫.১৫ শতাংশ হচ্ছে ১৫ বছরের নিচে অর্থাৎ শিশু। এদেশে প্রতি বছর প্রতিরোধযোগ্য রোগে ৫ বছরের কম বয়সী প্রায় ৮ লক্ষ ৭০ হাজার শিশু মারা যায়। এর মধ্যে শতকরা ৩০ ভাগ মারা যায় ডায়রিয়া বা ডায়রিয়া-জনিত রোগে। প্রায় শতকরা ৭০ জন শিশু পুষ্টিহীনতার শিকার। ভিটামিন এ-এর অভাবে প্রতিদিন ১০০ জন শিশু মারা যায়। আয়োডিনের অভাবে শতকরা ৩৮ জন শিশু বিভিন্ন রোগের আক্রমণের শিকার হয়। এদেশে ৬-১০ বছরের শতকরা ১৭ ভাগ শিশু আদৌ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় না এবং যারা ভর্তি হয় তাদের মধ্যে শতকরা ৪০ জন প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার আগেই স্কুল ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। এছাড়া শিশু সম্পর্কিত আরো অনেক পরিসংখ্যান রয়েছে যা আমাদের জন্যে সত্যি ভীতিকর। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এদেশের শিশুসমাজের উন্নয়নের জন্যে ১৯৯৪ সালের জাতীয় শিশুনীতি, ১৯৯০-১৯৯৫ সাল মেয়াদে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা এবং নারীশিশু দশক ১৯৯১-২০০০-এর কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৯৭-২০০২) বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় এবং এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্যে নারী উন্নয়ন কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত করে সর্বমোট ২৭৬০ মিলিয়ন টাকা বরাদ্দ করা হয়।^{২১} বিশ্বের প্রত্যেকটি দেশে যেখানে নারী ও শিশু উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়, সেখানে আমাদের দেশে এক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্ব দেয়া হয়। তদুপরি কর্মসূচির স্বল্পতা, অপরিপূর্ণ অর্থ বরাদ্দ, প্রশাসনিক অদক্ষতা, দুর্নীতি ও অপচয়, অন্যান্য কর্মসূচির সাথে শিশু উন্নয়ন কর্মসূচির সম্পৃক্ততা, সুনির্দিষ্ট নীতি ও পরিকল্পনার অভাব ইত্যাদি কারণে শিশু উন্নয়নকে দ্রুত এগিয়ে নেয়া সম্ভব হচ্ছে না।

স্বাস্থ্যসেবা মানুষের একটি মৌলিক অধিকার। কিন্তু এদেশের স্বাস্থ্যসেবার অবস্থা ও মান বেশ নাজুক। ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত এদেশের শতকরা ৪০ ভাগ লোকের স্বাস্থ্য সেবায় প্রবেশগম্যতা ছিলো না।^{২২} আবার স্বাস্থ্যখাতে জনসংখ্যা প্রতি হাসপাতাল, ডাক্তার, নার্স শয্যা সংখ্যার স্বল্পতার কারণে উন্নত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না। বর্তমানে এদেশের শিশু মৃত্যুহার (প্রতি হাজারে ৭৭ জন) হ্রাস এবং গড় আয়ুষ্কাল (বর্তমানে প্রায় ৬০ বছর) বৃদ্ধি পেলেও অন্যান্য উন্নত দেশের তুলনায় তা সন্তোষজনক নয়।^{২৪} আবার স্বাস্থ্যসেবার আয়তন কিছুটা সম্প্রসারিত হলেও হাসপাতালের শয্যা এবং ডাক্তার প্রতি জনসংখ্যা এখনো অনেক বেশি। অর্থাৎ বলা যেতে পারে, এদেশে স্বাস্থ্যসেবার মান এখনো সন্তোষজনক অবস্থায় পৌঁছতে পারেনি। ফলে সবার জন্যে উন্নত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না (সারণি-১৪)।

সারণি - ১৪ : বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা

সূচক	সংখ্যা
সরকারি হাসপাতাল শয্যাপ্রতি জনসংখ্যা (২০০১)	৪০৩৬ জন
রেজিস্টার্ড ডাক্তার প্রতি জনসংখ্যা (২০০০)	৩৯৭৭ জন
প্রথম বিবাহে মহিলাদেও গড় বয়স (২০০০)	২০.৬০ বছর
সুপেয় পানি গ্রহণকারী	৪০.৩০ জন
বয়স্ক শিক্ষার হার (১৫+) ২০০১ (%)	৬৫%

সূত্র: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০২, অর্থবিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা

একটি দেশের প্রশাসনিক, সমাজকল্যাণ ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্যে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ একান্ত প্রয়োজন। বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশে রাজস্ব খাত থেকে পর্যাপ্ত আর্থিক বরাদ্দের মাধ্যমে সার্বিক উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। বাংলাদেশ সরকার অন্যান্য সেবা খাতের পাশাপাশি জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় অর্থ রাজস্ব খাত থেকে ব্যয় করে থাকে। যদিও এ জাতীয় খাতে অর্থ বরাদ্দ ক্রমান্বয়ে কিছুটা বৃদ্ধি পাচ্ছে তবুও তা দেশের জনকল্যাণে প্রয়োজন ও চাহিদার তুলনায় খুবই অপরিপূর্ণ (সারণি-১৫)। ফলে সরকারকে নির্ভর করতে হয় বেসরকারি সংস্থা ও বৈদেশিক সাহায্যের উপর যা অনেকাংশে দেশের জন্যে নেতিবাচক প্রভাব বয়ে আনছে। প্রকৃতপক্ষে বেসরকারি সংস্থাসমূহের জনকল্যাণ কার্যাবলীর উদ্দেশ্য প্রায়শই মুনাফা-নির্ভর হলেও এসব সংস্থার কার্যক্রম কিছুটা হলেও জনকল্যাণে অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছে।

সারণি - ১৫ : বাংলাদেশে সামাজিক খাতে রাজস্ব বরাদ্দ (কোটি টাকায়)

বিষয়	১৯৯১-৯২	১৯৯৪-৯৫	১৯৯৯-২০০০	২০০১-২০০১
শিক্ষা ও ধর্ম	১৩৯৩	২০২৩	৩২৭৯	৩৬৬০
স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা	৪৩১	৬৮৫	৯৭২	১২৫২
যুব, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	২৩	৩৮	৭৩	৬২
শ্রম ও জনশক্তি	১৫	২১	৩১	৩৫
সমাজসেবা ও মহিলা কল্যাণ	৫১	৭৩	১৭৭	২২২

সূত্র: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০২, অর্থবিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা, পৃষ্ঠা-২৭

আয়তন ও সম্পদের তুলনায় বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা ও এর বৃদ্ধির হার কাম্যস্তরের অনেক উপরে অবস্থান করছে। দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা সমস্যার কারণে সরকারকে উন্নয়নমূলক কর্মসূচি পরিচালনায় রীতিমত হিমশিম খেতে হয়। এদেশে প্রতিবছর যে পরিমাণ মোট জাতীয় আয় উপার্জিত হয় তা দেশের ব্যয় অপেক্ষা অনেক কম থাকায় অধিকাংশ সময় সরকারকে ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে কাজ করতে হয়। ফলে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের স্বাভাবিক গতি বারবার হাঁচট খাচ্ছে (সারণি-১৬)।

সারণি - ১৬ : সরকারি আয়/ব্যয় ২০০১ (জিডিপি শতকরা হার)

সূচক	শতকরা হার (%)
মোট ব্যয়	১৪.২
মোট আয়	৯.৮
সার্বিক ঘাটতি (বৈদেশিক অনুদান ব্যতীত)	৪.৪

সূত্র: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০২, অর্থবিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা

ভৌগোলিক অবস্থানগত দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থা প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবলিত। প্রায় প্রতি বছর বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টির মতো কোন না কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে এদেশে জান-মালের ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। বিশেষ করে বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের কারণে এদেশের লক্ষ লক্ষ পরিবার সহায় সম্বলহীন হয়ে পড়ছে। এর ফলে অনেক একক পরিবার উপার্জনক্ষম ব্যক্তিদের হারিয়ে নেতৃত্বহীন, দুর্বল ও নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে। আবার বৈষয়িক, অবৈষয়িক সম্পদের ব্যাপক ক্ষতির কারণে দেশের চলমান অর্থনীতিতে একটা গভীর সংকটের সৃষ্টি হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে একদিকে দেশের রাজস্ব ঘাটতি ক্রমশ বেড়ে চলেছে। অপর দিকে জনগণ বাঁচার প্রয়োজনে শ্রমমুখী হচ্ছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এদেশে শিশুরা। পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তির মৃত্যু বা পঙ্গুত্ব এবং সহায়-সম্পদের ব্যাপক ক্ষতির কারণে শিশুদের স্বাভাবিক শিক্ষা জীবন ব্যাহত হচ্ছে। অনেক শিশু স্বচ্ছল জীবনের প্রত্যাশায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিদ্যার্জনের পরিবর্তে বিভিন্ন প্রকার শ্রমে নিয়োজিত হচ্ছে। উপরন্তু অনেক শিশু প্রাকৃতিক দুর্যোগের নির্মম শিকার হয়ে তাদের পিতামাতা, পরিবার পরিজনকে হারিয়ে নিজেদেরকে দুঃস্থ, এতিম, অসহায় কিংবা পথশিশু হিসেবে নাম লিপিবদ্ধ করছে।

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি নবীনতম রাষ্ট্র। একদলীয় আধিপত্য থেকে একদলীয় শাসন, সামরিক শাসন থেকে বর্তমানে দেশে গণতান্ত্রিক ক্রান্তিকাল বিরাজ করছে। স্বাধীনতার পর থেকে এদেশের রাজনীতিতে বিভিন্ন প্রকার অস্থিরতা বিরাজ করছে। স্বাধীনতার পর বত্রিশ বছর অতিক্রান্ত হলেও এখনো পর্যন্ত এদেশে সুস্থ রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে উঠেনি। প্রায় প্রতিবছর কোন না কোন কারণে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। বিগত বছরগুলোতে এদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা কিছুটা উন্নত হলেও রাজনৈতিক

অস্থিরতার কারণে সার্বিকভাবে খুন, রাহাজানি, দুর্নীতি, ছিনতাই ইত্যাদি সামাজিক অপরাধ ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। আবার রাজনৈতিক সহিংসতার ফলে অনেক পরিবার তাদের উপার্জনক্ষম ব্যক্তিদের হারিয়ে সহায়-সম্বলহীন হয়ে পড়ছে। এতে করে অনেক শিশু তাদের পিতা-মাতাকে হারিয়ে এতিম ও অসহায় হয়ে যাচ্ছে। এদেশের জাতীয় পরিকল্পনায় শিশুদের যথাযথ বিকাশের অধিকারের কথা ব্যক্ত করা হলেও নানাবিধ কারণে তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে না। বিশেষ করে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের কারণে এক সরকারের গৃহীত পরিকল্পনা অন্য সরকার বিলুপ্ত করে দিচ্ছে। ফলে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কিছুটা নিশ্চিত করা গেলেও তা আরো দ্রুততর করা সম্ভব হচ্ছে না।

রাজনৈতিক অস্থিরতার পাশাপাশি এদেশে সুস্থ সাংস্কৃতিক অনুশীলনের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এদেশের বিভিন্ন স্তরে স্বল্প পরিসরে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড অনুশীলন করা হলেও প্রতিশ্রুতিশীল ভবিষ্যত জাতি গঠনে শিশুদের জন্যে ব্যাপক আকারে সাংস্কৃতিক বিকাশের অধিকার সুনিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না। এদেশের প্রত্যেকটি থানা পর্যায়ে একটি করে শিশু পার্ক তৈরির পরিকল্পনা গৃহীত হলেও দীর্ঘদিন যাবৎ তা অবাস্তবায়িত অবস্থায় রয়েছে। তাছাড়া যে সকল শিশুপার্ক ও চিত্তবিনোদন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে সেখানে সকল শিশুর প্রবেশাধিকার সুনিশ্চিত নয়। কেবলমাত্র স্বচ্ছল পরিবারের শিশুরা ঐ সকল পার্ক ও চিত্তবিনোদন কেন্দ্রে প্রবেশের সামর্থ্য রাখে। এদেশে প্রতি বছর বিশ্বশিশু দিবসে দরিদ্র, দুঃস্থ, অসহায়, সুবিধাবঞ্চিত, ছিন্নমূল ও পথশিশুদের নিয়ে সামান্য আলোচনা করা হয়। বাস্তবিক অর্থে তা কেবল একটি র্যালি আয়োজন এবং একটি গোঞ্জি বিতরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। আবার এ সকল কর্মসূচিতে গুটিকয়েক শিশুর অংশগ্রহণ থাকে। ফলে সকল শিশুর কল্যাণ নিশ্চিত হয় না।

বাংলাদেশে শিশুদের কল্যাণে সরকারি, বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক উদ্যোগ

বাংলাদেশের প্রতিকূল আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক অবস্থা এদেশের দরিদ্র, দুঃস্থ, অসহায়, সুবিধাবঞ্চিত, ছিন্নমূল, ও পথশিশুদের জীবনকে ক্রমান্বয়ে জটিল থেকে জটিলতর করে তুলছে। এদেশের সকল শিশুর যথাযথ কল্যাণ ও উন্নয়নের কথা বিবেচনা করে সরকারি, বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক উদ্যোগে বিভিন্ন সংস্থা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ জাতীয় শিশুদের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় ফিরিয়ে আনার জন্যে বহুমুখী কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। নিম্নে এ সকল কর্মসূচিকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করে আলোচনা করা হলো।

সরকারি উদ্যোগ

বাংলাদেশে দুঃস্থ, অসহায় ও সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের জন্যে সরকারিভাবে শিক্ষা ও পুনর্বাসনমূলক নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এ সকল কর্মসূচিকে সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৯৯২ সালে ৮টি মন্ত্রণালয়কে নিয়ে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটিতে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়, শিক্ষা, তথ্য, সমাজকল্যাণ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক, যোগাযোগ ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে

অন্তর্ভুক্ত করা হয়।^{২৫} এ সকল মন্ত্রণালয়ের মধ্যে বর্তমানে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে সকল শিশুকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা ও টিকা প্রদান করার ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে শিক্ষা থেকে ঝড়ে পড়া অসহায় শিশুদের জন্যে অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া দরিদ্র, কর্মজীবী, দুঃস্থ, অসহায় শিশুদের কর্মমুখী শিক্ষা প্রদানের জন্যে তাদের কর্মসংস্থানমূলক ক্রিয়াকলাপে সংগঠিত করা হচ্ছে।^{২৬} পাশাপাশি জীবনমুখী শিক্ষার মাধ্যমে শিশুদেরকে আত্মনির্ভরশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। এদেশের দুঃস্থ ও অসহায় শিশুদের শিক্ষা ও পুনর্বাসনে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক কতিপয় প্রাতিষ্ঠানিক সেবাকার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি সমাজসেবা অধিদপ্তর বহির্ভূত কিছু শিশুকল্যাণ কার্যক্রমও চালু হয়েছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে সরকারি শিশুকল্যাণ কার্যক্রমগুলোকে দুটি উপায়ে বিশ্লেষণ করা যায় যথা- সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রম এবং সমাজসেবা অধিদপ্তর বহির্ভূত কার্যক্রম। এসব কার্যক্রমের মধ্যে সমাজসেবা অধিদপ্তরের কার্যক্রমগুলো এদেশের শিশুকল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ হলেও এ জাতীয় কার্যক্রমগুলো প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। সমাজসেবা অধিদপ্তরের আওতায় পরিচালিত প্রধান প্রধান শিশুকল্যাণ কার্যক্রমগুলো হচ্ছে-

১) সরকারি শিশু পরিবার

১৯৪৩ সালে ৪টি এতিমখানা স্থাপনের মধ্য দিয়ে সর্বপ্রথম এতিম শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। প্রাক-স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা উত্তরকালে এদেশে সরকারি পর্যায়ে এতিমখানার সংখ্যা ছিলো ৭৮টি। স্বাধীনতা উত্তরকালে এসব এতিমখানাকে সরকারি শিশুসদন হিসেবে নামকরণ করা হয় এবং শিশুদেরকে পারিবারিক পরিবেশে লালন-পালনের উদ্দেশ্যে বিদেশী সংস্থা (এস ও এস) শিশুপল্ট্রী'র আঙ্গিকে সরকারি শিশুসদনগুলোকে পুনর্গঠন করে শিশুপরিবার-এ রূপান্তর করা হয়। বর্তমানে সারা দেশে জেলা ও থান সদরে (২০শে জুলাই ১৯৯৯ তারিখ পর্যন্ত হিসাব অনুযায়ী) ৭৩টি সরকারি শিশু-পরিবার চালু হয়েছে। এসকল প্রতিষ্ঠানে প্রায় ৯৪০০ জন এতিম শিশুকে লালন-পালনের পাশাপাশি শিক্ষা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা রয়েছে। এসকল প্রতিষ্ঠানে দুঃস্থ ও অসহায় শিশুদের দৈহিক ও মানসিক বিকাশে এবং তাদের সুনামগরিক হিসেবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে আবাসিক সেবা প্রদান করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা ও পুনর্বাসনমূলক কার্যক্রমগুলো হচ্ছে- আবাসন ও ভরণপোষণ, সাধারণ শিক্ষা (তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত), ধর্মীয় শিক্ষা, বিনোদন ও চিকিৎসা সেবা, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ (দর্জি বিজ্ঞান, ফুড প্রসেসিং, ওয়েলডিং, কার্পেন্টারী, বৈদ্যুতিক কাজ ইত্যাদি) ও পুনর্বাসন ইত্যাদি। এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ২৯৪০২ জন এতিম পুনর্বাসন করা হয়েছে।^{২৭}

২) ছোটমণি নিবাস (বেবী হোম)

শিশু পরিবার ব্যতীত পরিত্যক্ত, অবহেলিত ও অসহায় শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্যা জন্মে আরেকটি উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হচ্ছে ছোটমণি নিবাস। বর্তমানে এদেশে ৩টি

ছোটমণি নিবাস রয়েছে যার আসন সংখ্যা ২২৫টি। এ প্রতিষ্ঠানগুলোর বর্তমান নিবাসীর সংখ্যা ১০৭ জন।^{২৮} এখানে হাসপাতাল, পুলিশ ও অন্যান্য স্থান থেকে পিতৃমাতৃহীন বা পরিচয়বিহীন শিশুদের গ্রহণ করা হয় এবং ভর্তির মাধ্যমে ৫ বছর বয়স পর্যন্ত মাতৃস্নেহে লালন-পালন করা সহ চিকিৎসা, রক্ষণাবেক্ষণ, খেলাধুলা ও শিক্ষা প্রদান করা হয়।

৩) শিক্ষা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র

দুঃস্থ ও ভবঘুরে শিশু-কিশোর যাদের বয়স ৫-১৮ বছর তাদের লালনপালন, রক্ষণাবেক্ষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের জন্যে ১৯৮১ সালে গাজীপুর জেলায় এ কেন্দ্রটি স্থাপন করা হয়। এর বর্তমান আসন সংখ্যা হচ্ছে ৪০০টি। এখানে শিশুদের সাধারণ ও ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন ট্রেড-এ যেমন-চামড়ার কাজ, দর্জি বিজ্ঞান, মোটরগাড়ী চালানো ও মেরামত, টিনের জিনিসপত্র তৈরি ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সমাজে পুনর্বাসন করা হয়। এ যাবৎ ৮৮৬ জন শিশুকে এ কর্মসূচির আওতায় পুনর্বাসন করা হয়েছে।^{২৯} এছাড়া শিশুদের দৈহিক ও মানসিক উৎকর্ষতা সাধনে মানসিক গুণাবলী ও সুপ্ত প্রতিভার বিকাশে বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালনায় এ কেন্দ্রটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

৪) ভবঘুরে প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র

এদেশের সুখম আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের কথা বিবেচনা করে অসহায়, ভবঘুরে শিশু ও বয়স্ক ব্যক্তিদের ভরণপোষণ, রক্ষণাবেক্ষণ, সাধারণ শিক্ষা এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে কর্মক্ষম ও উৎপাদনশীল নাগরিক হিসেবে সমাজে পুনর্বাসিত করার লক্ষ্যে ১৯৪৯ সালে কুমিল্লা জেলার চাঁদপুরে সর্বপ্রথম ভবঘুরে কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। বর্তমানে এদেশে এ জাতীয় ভবঘুরে কেন্দ্রের সংখ্যা ৩টি। এসব কেন্দ্রের মাধ্যমে বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করা হলেও দেশের আর্থ-সামাজিক এদের মোট অনুমোদিত আসন সংখ্যা খুবই সীমিত।

৫) বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

এতিমখানার বয়স্ক কিশোরদের বিভিন্ন বিষয়ে কারিগরী ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে বর্তমানে সারাদেশে ৫টি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। এতিমদের আত্মনির্ভরশীল করে সমাজে পুনর্বাসন করার উদ্দেশ্যে এসব প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এছাড়া সমাজসেবা অধিদপ্তরের আওতায় ১৯৯২-৯৩ সালের উন্নয়ন পরিকল্পনায় শিশুকল্যাণে গৃহীত পদক্ষেপগুলো হচ্ছে- এতিম শিশুদের শিক্ষা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে কমিউনিটি ভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণ, এতিম শিশুদের জন্যে শিশু পরিবার (বগুড়া) স্থাপন, রাস্তায় বসবাসকারী দুর্দশাগ্রস্ত শিশুদের জন্যে কল্যাণ ও পুনর্বাসন প্রকল্প গ্রহণ, এতিম ও দুঃস্থ শিশুদের জন্যে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (জিয়ানগর, রাংগুনিয়া) স্থাপন করা ইত্যাদি।^{৩০}

এদেশের শিশুদের উন্নয়ন ও বিকাশে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ এখনো ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেনি। এক্ষেত্রে আমাদের অবস্থান পৃথিবীর উন্নত দেশের তুলনায় একেবারেই সীমিত। এদেশের প্রচলিত শিশুকল্যাণ কার্যক্রমগুলো কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে পরিচালিত হয় না

বরং বিচ্ছিন্ন কিছু কর্মসূচির মাধ্যমে এসব কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এখানে দরিদ্র, এতিম, দুঃস্থ, অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের কর্মমুখী ও আত্মনির্ভরশীল নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার জন্যে সরকারিভাবে কিছু সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করা হলেও এদেশে যে পরিমাণ দুঃস্থ ও অসহায় শিশু রয়েছে তার তুলনায় এসকল কার্যক্রম একেবারেই সীমিত এবং এগুলো শহরকেন্দ্রিক। যেখানে মোট জনসংখ্যার ৮০ ভাগ পল্লী এলাকায় বসবাস করে, যেখানে শিশুরা অর্থনৈতিক, সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক ও স্বাস্থ্যগত দিক থেকে মারাত্মকভাবে সমস্যাক্রান্ত, সেখানে শিশুকল্যাণ কার্যক্রমকে গ্রাম পর্যায়ে সম্প্রসারিত করা সম্ভব হচ্ছে না। শিশুকল্যাণে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তা আবার আর্থিক সংকটে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করাও যাচ্ছে না। অর্থাৎ সমাজকল্যাণ খাতে সরকারের স্বল্প বরাদ্দ, বরাদ্দকৃত অর্থপ্রাপ্তিতে বিলম্ব, প্রশাসনিক জটিলতা, দুর্নীতি ইত্যাদি কারণে দুঃস্থ শিশুদের গৃহীত কার্যক্রমের যথাযথ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে না।

বেসরকারি উদ্যোগ

বাংলাদেশের প্রতিকূল আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক অবস্থার কারণে দরিদ্র, দুঃস্থ, অসহায়, ছিন্নমূল সুবিধাবঞ্চিত ও পথশিশুদের ব্যাপকহারে শিশুশ্রমে নিয়োজিত হওয়াটা কোন সভ্য সমাজের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সুখকর নয়। এ সত্যটি উপলব্ধি করে এদেশের শিশুসমাজের কল্যাণে সরকারি পর্যায়ে অল্প-বিস্তর কার্যক্রম গ্রহণের পাশাপাশি বর্তমানে বেসরকারি সংস্থাগুলোকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণে উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে। সরকারের এ আহবানে সাড়া দিয়ে এদেশে ৬টি বিভাগে ৪১৮টিরও অধিক বেসরকারি সংস্থা গ্রাম ও শহর এলাকায় অপেক্ষাকৃত দুর্দশাক্রান্ত শিশুদের জন্যে নানামুখী শিক্ষা, স্বাস্থ্য পুনর্বাসনমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এ সংস্থাগুলোর এ জাতীয় কার্যক্রমের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে এদেশের আর্থ-সামাজিকভাবে দুর্দশাক্রান্ত শিশুদেরকে শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক জীবন সম্পর্কে সচেতনতা আনয়নপূর্বক তাদেরকে ভবিষ্যৎ জীবনে যোগ্য, দক্ষ ও আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা এবং শ্রম প্রদানে নিরুৎসাহিত করা। এ লক্ষ্যে বেসরকারি সংস্থাগুলোর সারাদেশে ১,২১,১৫৩টিরও বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রায় ৪ লক্ষ শিশুকে বিভিন্ন পর্যায়ে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদানের কাজে নিয়োজিত রয়েছে।^{৩১} এ সকল প্রতিষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী শিশুদের মধ্যে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের শিক্ষা গ্রহণের হার কিছুটা বেশি। গ্রাম এলাকায় তুলনামূলক কম সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিশুদের শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। আবার গ্রাম পর্যায়ে তুলনামূলকভাবে কম সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এ জাতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করা হলেও ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা শহরের তুলনায় বেশি (সারণি-১৭)।

সারণি - ১৭ : বাংলাদেশের বেসরকারি সংস্থাসমূহের অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম (গ্রাম ও শহর পর্যায়ে)

পর্যায়	স্থান	এনজিও সংখ্যা	শিক্ষা কেন্দ্র	Enrollment		মোট
				ছেলে	মেয়ে	
জাতীয় পর্যায়	মোট	৪১৮	১২১১৩৫	১৬৩৫৩২২	১৯৯৮৭২৮	৩৬৩৪০৫০
	গ্রাম	৯৮	১১৪৩৭০	১৫৪৩৯৯৫	১৮৮৭১০৫	৩৪৩১১০০
	শহর	৩২০	৬৭৬৫	৯১৩২৭	১১১৬২৩	২০২৯৫০
ঢাকা	গ্রাম ও শহর	২৩৮	৪১০৬১	৫৩৩৮৩৭	৬৭৩৯১৩	১২৩০৭৫০
চট্টগ্রাম	গ্রাম ও শহর	৪১	২৪৬০০	৩৩২১০০	৪০৫৯০০	৭৩৮০০০
রাজশাহী	গ্রাম ও শহর	৫৯	২৮৮৪০	৩৮৯৩৩৯	৪৭৫৮৬৯	৮৬৫২০০
খুলনা	গ্রাম ও শহর	৬০	১৫৩০০	২০৬৫৫০	২৫২৪৫০	৪৫৯০০০
বরিশাল	গ্রাম ও শহর	১৩	৪৪২৫	৫৯৭৩৮	৭৩০১২	১৩২৭৫০
সিলেট	গ্রাম ও শহর	৭	৬৯৪৫	৯৩৭৫৮	১১৪৫৯২	২০৮৩৫০

Source : The year 2000, Assessment Report, Primary Mass Education Centre, Dhaka, p 57

উপর্যুক্ত সংস্থাগুলো ছাড়াও এদেশে শিশুদের কল্যাণে গ্রাম ও শহর উভয় পর্যায়ে অনেক বেসরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা নিয়োজিত রয়েছে। এসব সংস্থার মধ্যে প্রধান কয়েকটি সংস্থা ও তাদের পদক্ষেপগুলো হচ্ছে-

১) বাংলাদেশ শিশুকল্যাণ পরিষদ

বাংলাদেশ শিশুকল্যাণ পরিষদ শিশুদের সামগ্রিক কল্যাণ সাধনের জন্যে গঠিত একটি সমন্বয়ধর্মী বেসরকারি সংস্থা। ১৯৫৭ সালে বেগম শামসুন নাহার মাহমুদের উদ্যোগে পূর্ব-পাকিস্তান শিশুকল্যাণ পরিষদ নামে সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতা উত্তরকালে এ সংস্থা বাংলাদেশ শিশুকল্যাণ পরিষদ নাম ধারণ করে। এ সংস্থার উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে এদেশের শিশুকল্যাণে নিয়োজিত বিভিন্ন সংস্থার কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয় সাধন, শিশুদের সামগ্রিক উন্নয়ন, শিশু অধিকার সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তোলা, শিশুদের বিভিন্ন সমস্যা উদ্ঘাটন করা এবং তা মোকাবেলায় দিক-নির্দেশনা প্রদান করা, শিশুকল্যাণ নীতি প্রণয়নে সরকারকে পরামর্শ দান করা ইত্যাদি। এ লক্ষ্যার্জনে সংস্থাটির উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো হচ্ছে-পুস্তক শিশুদের জন্যে চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম গ্রহণ করা, শিশুকলা ভবন ও শিশু পাঠাগার স্থাপন করা, শিশুদের কল্যাণে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা, শিশুদের জন্যে জাতীয় ভিত্তিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা এবং শিক্ষামূলক বই-পুস্তক প্রকাশ করা, চিত্তবিনোদনমূলক বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা, সমাজসেবামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা ইত্যাদি।

২) Under Privileged Children's Educational Programme (UCEP)- Bangladesh

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রফেসর ডঃ আহমদুল্লাহ মিয়া 'Study on Child Labour in Dhaka City' নামক গবেষণা কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে ১৯৭২ সালে পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে ইউসেপ-এর যাত্রা শুরু হয়। এ প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশ তথা উন্নয়নশীল বিশ্বে শিশুশ্রম দূরীকরণে কার্যকর মডেল হিসেবে ইতোমধ্যে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এদেশের শহর এলাকায় শ্রমজীবী শিশু-কিশোর যাদের বয়স ১০-১৪ বছর এবং যারা বিভিন্ন বস্তিতে কিংবা নিয়োগকর্তার বাড়িতে বা কর্মস্থলে বসবাস করে তাদেরকে কেন্দ্র করেই এর কার্যক্রম গৃহীত হয়। এ সংস্থার প্রধান উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে- শহর এলাকায় কর্মজীবী, বস্তিবাসী ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদেরকে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষা প্রদান করা, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা, যথাযথ কর্মসংস্থানের মাধ্যমে মানব সম্পদে পরিণত করা। সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের কল্যাণে এ সংস্থার (ইউসেপ) পরিচালিত বর্তমান কার্যক্রমগুলো হচ্ছে- কম সুবিধাপ্রাপ্ত শিশুদের মৌলিক শিক্ষা প্রদান করা। এলক্ষ্যে বর্তমানে ঢাকা, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগে ৩০টি স্কুলের মাধ্যমে ৪ বছর মেয়াদে প্রায় ২০ হাজার ছাত্র-ছাত্রীকে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা প্রদান, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনাতে ৩টি কারিগরি বিদ্যালয়ের মাধ্যমে প্রায় ১৫০০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে কার্পেন্টারী, টেক্সটাইল, অটোমোবাইল, ওয়েলডিং, ইলেকট্রনিক্স, রেফ্রিজারেশন ও এয়ার কন্ডিশনিং, গার্মেন্টস ফিনিশিং ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান, প্যারা-ট্রেড প্রশিক্ষণের আওতায় ঢাকা ও চট্টগ্রামে ৩টি প্রশিক্ষণ প্রদান এবং পুনর্বাসন ও কর্মসংস্থান কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিশুদের (১৯৯৮-৯৯ সালে এ প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ৯৩.৭০% জনকে) পুনর্বাসন করা হয়।^{৩২} এছাড়া ইউসেপ সুবিধাবঞ্চিত অসহায় শিশুদের কার্যকর মানব সম্পদে রূপান্তর করে সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। এটি শিশু উন্নয়নে একটি কার্যকর প্রতিষ্ঠান।

৩) বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম

বিশ্বজুড়ে শিশুদের অবনতিশীল অবস্থার প্রেক্ষাপটে তাদের সার্বিক উন্নয়ন এবং স্বার্থ সুরক্ষার জন্যে সরকারি কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি বেসরকারি সংগঠনগুলোর একটি বিশেষ ফোরাম হিসেবে ১৯৯০ সালে বাংলাদেশে শিশু অধিকার ফোরাম-এর আত্মপ্রকাশ ঘটে। শুরুতেই এই ফোরামের সদস্য সংখ্যা ১৮টি হলেও বর্তমানে এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১১৯টিতে উন্নীত হয়েছে।^{৩৩} তৃণমূল পর্যায়ে জাতীয় শিশু অধিকার সনদ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ ফোরাম শিশুদের জন্যে ৫ বছর মেয়াদী ন্যাশনাল প্লান অব এ্যাকশন ফর চিলড্রেন প্রণয়ন, জাতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিশু অধিকার অন্তর্ভুক্তকরণ, জাতীয় শিশুনীতি প্রণয়ন প্রভৃতি কার্যক্রমে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। এ ফোরামের চলতি কার্যক্রমগুলো হচ্ছে-নেটওয়ার্কিং এন্ড এডভোকেসী ফর চাইল্ড রাইটস ইন

বাংলাদেশ নামক কার্যক্রমের আওতায় শিশুদের নিয়ে সরকারি উদ্যোগের সাথে যৌথভাবে ইনফরমাল গ্রুপ গঠন, প্রায়োগিক গবেষণা ও প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা; চাইল্ড লেবার ইনফরমেশন এ্যান্ড রিসোর্স সেন্টার প্রকল্পের আওতায় শিশুশ্রম সংক্রান্ত সম্ভাব্য সকল তথ্য ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান; আই এল ও বা আই পি ই সি-এর সহযোগিতায় শিশুশ্রম রোধে দেশব্যাপী ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি করা, এবং অন্যান্য কার্যক্রম যেমন- প্রতি বছর শিশু-অধিকার সপ্তাহ উদযাপন, শিশু-অধিকার বিষয়ক বাণী প্রচার করা ইত্যাদি।

৪) অপরাজেয় বাংলাদেশ (Aparajeyo Bangladesh)

অপরাজেয় বাংলাদেশ একটি শিশু অধিকার সংগঠন হিসাবে ১৯৬৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে ঢাকা শহরের বস্তিবাসী শিশুদের অভাব, নিরাপত্তাহীনতা এবং অস্বাস্থ্যকর নোংরা পরিবেশ থেকে রক্ষা করা। এ লক্ষ্যার্জনে এ সংগঠনের মূল কর্মসূচি হচ্ছে- বস্তিবাসী ও কর্মরত শিশু, মাতা এবং পিতাদের সমন্বয়ে ৩টি দল গঠন করা: পথশিশু (৮-১৬ বছর) দের জন্যে ১৪টি ওপেন এয়ার স্ট্রীট স্কুল, ২টি ড্রপ ইন সেন্টার, ১টি ক্লাব ফর বয়েজ এ্যান্ড গার্লস এবং ১টি গার্লস হোস্টেল পরিচালনা; বস্তিবাসী শিশু (৬মাস-৩ বছরের পরিচয় বিহীন শিশু, ৪-১১ বছরের স্কুল বহির্ভূত দুঃস্থ শিশু, ১২-১৬ বছরের বধিগত ও শোষিত শিশু)-দের জন্যে বস্তিভিত্তিক দিবায়ত্ব কেন্দ্র ও শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন, ৮-১৪ বছরের কর্মজীবী শিশুদের জন্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ, স্বাস্থ্য পরিচর্যা কর্মসূচী গ্রহণ করা ইত্যাদি।^{৩৪}

৫) কৈশোর বাংলাদেশ

কৈশোর বাংলাদেশ অন্যতম একটি আঞ্চলিক বেসরকারি সংস্থা। এ সংস্থা ২০০১ সালে যুক্তরাজ্য ভিত্তিক আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা নিউহাম বেঙ্গলী ট্রাস্টের আর্থিক সহায়তায় সিলেট শহরের শ্রমজীবী, দুঃস্থ ও পথশিশুদের জন্যে জীবন ভিত্তিক শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, বিনোদন, জরুরী আশ্রয় ও কর্মমুখী প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়নে কাজ শুরু করে। বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠানের ৭টি মৌলিক শিক্ষাকেন্দ্র রয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানের মূল কর্মসূচিগুলো হচ্ছে- শ্রমজীবী, দুঃস্থ ও পথশিশুদের জন্যে মৌলিক শিক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ, স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, জরুরী আশ্রয়ের ব্যবস্থাকরণ, বিনোদনমূলক কর্মসূচি গ্রহণ, পুনর্বাসনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান, শিশু প্রতিপালন, আয় বর্ধনমূলক কার্যক্রম গ্রহণ, পরামর্শ প্রদান, স্বার্থ সংরক্ষণ ও প্রচার করা ইত্যাদি। বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমকে বিভিন্ন জেলায় সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।^{৩৫}

৬) ব্র্যাক (BRAC)

১৯৭২ সালে একটি বেসরকারি সংস্থা হিসেবে ব্র্যাক আত্মপ্রকাশ করে। এ প্রতিষ্ঠান আর্থ-সামাজিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া গ্রামীণ দুঃস্থ, অসহায় এবং সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় মৌলিক শিক্ষা প্রদানে কাজ করে থাকে। যে সমস্ত দুঃস্থ ও অসহায় শিশু আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করতে পারে না, তাদেরকে মৌলিক শিক্ষা

প্রদানের জন্যে আশির দশকে সর্বপ্রথম এ কার্যক্রম চালু করা হয়। বর্তমানে এ কার্যক্রমের আওতায় তিন ধরনের লক্ষ্যদল (৮-১০ বছর বয়সী বালক-বালিকা, ১১-১৪ বছর বয়সী শিশু এবং ১১-১৬ বছর বয়সী মেয়েশিশু)-কে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান করা হয়। এ শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে ব্র্যাক গ্রামীণ শিশুদের জীবনমান উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। পাশাপাশি এ সকল শিশুদের পারিবারিকভাবে পুনর্বাসন করার জন্যে পরিবারভিত্তিক ঋণদান কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে প্রায় তিনশত বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাকের সাথে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।^{৩৬}

৭) Appropriate Resources for Improving Street Children's Environment (ARISE)

বর্তমানে দেশের বিভিন্ন বিভাগে ৯টি বেসরকারি সংগঠন সুবিধা বঞ্চিত, দুঃস্থ ও পথশিশুদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এ প্রকল্পের আওতায় কাজ করে থাকে। এ প্রকল্পের অর্থায়ন করে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (UNDP) এবং তত্ত্বাবধান করে বাংলাদেশ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়। এ প্রকল্পের আওতায় শিশুদেরকে অনানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা হয়। এখানে শিশুদের পুনর্বাসনের জন্যে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। যে সকল শিশু রাস্তায় কাজ করে, যাদের পিতামাতা নেই, তারাই এ কার্যক্রমের লক্ষ্যদল হিসেবে বিবেচিত হয়।

৮) বেসরকারি এতিমখানা

এদেশের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে অনাথ ও দুঃস্থ শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে দানশীল ব্যক্তিবর্গ ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের যৌথ প্রচেষ্টায় অনেক এতিমখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সমগ্র দেশের বিভাগীয় শহর, জেলা শহর, থানা সদর ও পল্লী গ্রামে ১৮০০ এর অধিক নিবন্ধীকৃত এতিমখানা রয়েছে। তন্মধ্যে ১৯৯৮-৯৯ সাল পর্যন্ত সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত এতিমখানার সংখ্যা ১২৬৫টি যার আসন সংখ্যা ২০,৩১২টি। এ প্রতিষ্ঠানগুলোতে অসহায় ও দুঃস্থ শিশুদের সংখ্যা প্রায় ৭০-৮০ হাজার। এসব প্রতিষ্ঠানে দুঃস্থ ও অসহায় শিশুদের বিনামূল্যে খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়সহ যাবতীয় সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হয়।^{৩৭} এছাড়া এর আওতায় শিশুদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদানের উদযোগও গ্রহণ করা হয়েছে।

৯) ঢাকা আহছানিয়া মিশন

এটি একটি জাতীয় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা। ১৯৫৮ সালে খান বাহাদুর আহছানউল্লাহ কর্তৃক এ সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এদেশের শিশু-কিশোরদের কল্যাণে এ মিশনের উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি হচ্ছে শিক্ষা কর্মসূচি। এ কর্মসূচির আওতায় তিন ধরনের বয়সী শিশুদের শিক্ষা প্রদান করা হয়। যথা - ৫ বছর বয়সী শিশুদের জন্যে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি, ৬-৭ বছর বয়সী স্কুলবহির্ভূত শিশুদের জন্যে প্রারম্ভিক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি ও ৮-১০ বছর বয়সী শিশুদের জন্যে দ্বিতীয় সুযোগ হিসেবে শিক্ষা কর্মসূচি এবং ১১-১৪ বছর বয়সী কিশোরদের জন্যে চাহিদা ও কাজ উপযোগী ১৫ মাস ব্যাপী শিক্ষা কর্মসূচি।^{৩৮}

শিশুদের সার্বিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্যে উল্লেখিত বেসরকারি সংস্থাগুলোর পাশাপাশি আরো অসংখ্য বেসরকারি সংস্থা নিয়োজিত রয়েছে। এদের মধ্যে মুকুল ফৌজ, খেলাঘর, আরামবাগ ক্লাব, নয়াবাজার ড্রপ-ইন-সেন্টার, মোহাম্মদপুর হোস্টেল, চিলড্রেন ভিলেজ, ছিন্নমূল, ফাতেমা, ধর্মরাজিক অরফানেজ, এ্যাসিসট্যান্স ফর স্লাম ডুয়েলার্স, সোসাইটি ফর সোশ্যাল সার্ভিস, বিকাশ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এসব সংস্থা এদেশের শিশুদের শিক্ষা, পুনর্বাসন ও আশ্রয়নের জন্যে বহুবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, এদেশে দরিদ্র, দুঃস্থ, এতিম, অসহায়, ছিন্নমূল ও পথশিশুদের মোট সংখ্যার তুলনায় এ সংস্থাগুলোর কার্যক্রম অত্যন্ত সীমিত। আবার এ কার্যক্রমগুলোর অধিকাংশই শহরকেন্দ্রিক। ফলে ব্যাপক সংখ্যক শহুরে ও গ্রামীণ শিশু জীবনগড়ার সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। অন্যদিকে এজাতীয় সংস্থাগুলোর অধিকাংশই বিদেশী সাহায্য নির্ভর হওয়ায় এবং পর্যাপ্ত আর্থিক বরাদ্দের অভাবে গৃহীত কর্মসূচিগুলো এদেশের শিশুদের কল্যাণে যথাযথ অবদান রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে। তা সত্ত্বেও এদেশে শিশুদের কল্যাণে বেসরকারি কার্যক্রমের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

আন্তর্জাতিক উদ্যোগ

বাংলাদেশের শিশুসমাজের কল্যাণে সরকারি ও বেসরকারি কার্যক্রমের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর উদ্যোগও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এ সকল সংস্থা বাংলাদেশ সরকার ও বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থাকে বৈষয়িক ও কারিগরী সাহায্য প্রদান করে থাকে। এদেশের শিশুকল্যাণে উল্লেখযোগ্য আন্তর্জাতিক সংস্থা ও তাদের গৃহীত উদ্যোগগুলো হচ্ছে-

১) জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক জরুরী শিশু তহবিল (ইউনিসেফ)

এ সংস্থাটি বর্তমান বিশ্বের প্রায় ১২১টি দেশে শিশু অধিকার নিশ্চিতকরণে কাজ করে থাকে। সংস্থাভূক্ত প্রত্যেকটি দেশের সরকারকে শিশুদের কল্যাণে ও উন্নয়নে সক্ষম করে গড়ে তোলার জন্যে সুনির্দিষ্ট কিছু পদক্ষেপ গ্রহণে সহায়তা প্রদান করাই ইউনিসেফের অন্যতম লক্ষ্য। এ সংস্থাটি শিশুকল্যাণে বাংলাদেশ সরকারকে সহায়তা প্রদানের জন্যে কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ সংস্থার গৃহীত পদক্ষেপগুলো হচ্ছে- (১) শিশুদের জন্যে গৃহীত পরিকল্পনা সম্প্রসারণে বাংলাদেশ সরকারকে পরামর্শ প্রদান করা, (২) স্বাস্থ্যকর্মী, শিক্ষক, খাদ্য বিশেষজ্ঞ ও শিশু কল্যাণ বিশেষজ্ঞসহ বিভিন্ন ব্যক্তির প্রশিক্ষণের জন্যে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা, (৩) শিশুদের জন্যে পাঠ্যপুস্তক, বিশুদ্ধ পানি, ঔষধ ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা। বর্তমানে এ সংস্থাটি বাংলাদেশ সরকারের সহায়তায় বিভিন্ন প্রকার শিশুকল্যাণমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে। এ সংস্থার বাংলাদেশ কান্ট্রি সহযোগিতা (১৯৯৬-২০০০)-এর লক্ষ্য ছিলো শিশুদের জন্যে সকল তৎপরতাকে শিশুর অধিকার সংক্রান্ত কনভেনশন এবং ১৯৯০ সালের শিশু বিষয়ক বিশ্ব সম্মেলনের ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনার সাথে সংগতিপূর্ণ করা।^{৩৯} এছাড়া শিশুদের যথাযথ বিকাশে ও স্বার্থরক্ষার জন্যে সাম্প্রতিক কালে “শিশুদের জন্যে হ্যাঁ বলুন” প্রকল্প চালু করেছে।

২) বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

বিশ্বব্যাপী মানব সমাজের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও উন্নয়নে জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থা হিসেবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কাজ করে থাকে। জন্মালগ্ন থেকেই এ সংস্থাটি সদস্যভুক্ত প্রত্যেকটি দেশের মতো বাংলাদেশেও এর রিজিওনাল ও কান্ট্রি অফিসের মাধ্যমে এদেশের জনস্বাস্থ্য রক্ষার পাশাপাশি শিশুদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার ও তাদের যথাযথ বিকাশের জন্যে কাজ করে থাকে। সংস্থাটি এদেশে স্বাস্থ্যনীতি ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জাতীয় স্বাস্থ্যবিষয়ক তথ্য পদ্ধতির উন্নয়ন এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক জরুরী অবস্থা মোকাবেলার জন্যে একটি ব্যাপক পরিকল্পনা এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের বিভাগসমূহের আধুনিকীকরণে ব্যাপক সহায়তা প্রদান করে থাকে। সমন্বিত রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির মাধ্যমে কুষ্ঠ, পোলিও এবং অপ্রতিরোধ্যযোগ্য অন্যান্য শিশুরোগ বিরোধী অভিযানে সমর্থন দিয়ে থাকে। বিশ্বব্যাপী ৬টি অপ্রতিরোধ্য শিশুরোগ বিস্তারের বিরুদ্ধে একটি উন্নততর পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যেও এ সংস্থা কাজ করে থাকে। এছাড়া জাতীয় টিকা দিবস উদযাপনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা ছাড়াও এদেশের অপেক্ষাকৃত সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের যথাযথ স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে এ প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

৩) আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO)

আইএলও ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশে তার কর্মতৎপরতা শুরু করে। এদেশে শিশুশ্রম রোধে ও শিশু নির্যাতন বন্ধের ক্ষেত্রে এ সংস্থা বিশেষ সহায়তা প্রদান করে থাকে। এ লক্ষ্যে সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণের বিভিন্ন কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করা হয়। এদেশের রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ শিল্প এলাকা (EPZ)-তে কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি ও সামাজিক জীবনযাত্রা বিষয়ক কার্যক্রমের মাধ্যমে সংস্থাটি কাজ শুরু করে। পরবর্তীতে ইউনিসেফ এবং বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুত ও রপ্তানীকারক সংস্থা (বিজিএমইএ)-এর সহায়তায় এদেশের পোশাক শিল্পে শিশুশ্রম বিলুপ্ত করার জন্যে কাজ শুরু করে। বর্তমানে সংস্থাটি এদেশে শিশুশ্রম বন্ধে ও শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণে রাষ্ট্র কর্তৃক অনুসমর্থিত আইএলও কনভেনশনগুলো বাস্তবায়নে নানামুখী প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

৪) জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা (UNESCO)

জাতিসংঘের আরেকটি উল্লেখযোগ্য অঙ্গসংস্থা হচ্ছে ইউনেস্কো। বিশ্বব্যাপী শিশুদের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে এ সংস্থা কাজ করে থাকে। বাংলাদেশে ১৯৯৬ সালে ঢাকায় আঞ্চলিক অফিস স্থাপনের মাধ্যমে এ সংস্থা জোরালোভাবে কাজ শুরু করে। সংস্থাটি শিশুকল্যাণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারকে যে সব সহায়তা প্রদান করে থাকে, সেগুলো হচ্ছে (১) এদেশের দরিদ্র, দুঃস্থ ও অসহায় শিশুসহ সকল শিশুর জন্যে শিক্ষা নিশ্চিত করা, (২) প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে সংস্কারের মাধ্যমে যুগোপযোগী শিক্ষা পদ্ধতি উদ্ভাবন করা, (৩) শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রবেশ ও অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করার জন্যে ছেলে ও মেয়ে উভয়ের সমান সুযোগ প্রদান করা, (৪) শিশুদের জন্যে যথাযথ সাংস্কৃতিক ভিত্তি প্রস্তুত করা ইত্যাদি। এছাড়া সংস্থাটি শিশুদের শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা এবং দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে মানব উন্নয়নের জন্যে জাতীয় পর্যায়ে ওয়ার্কশপ, সেমিনার, গোলটেবিল বৈঠক ও

ট্রেনিং কোর্সের আয়োজন করে থাকে। বর্তমানে এটি ইউএনডিপি'র আর্থিক সহযোগিতায় ১৮টি জেলায় ২২টি এনজিও এবং আনুষ্ঠানিক শিক্ষা পরিদপ্তরকে শিশুশিক্ষা বিস্তারে সহায়তা প্রদান করছে।^{৪০}

৫) জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল

এ সংস্থাটি বাংলাদেশে প্রসূতিমৃত্যু, শিশুমৃত্যু ও অবাক্সিত গর্ভধারণ হ্রাস করে স্থিতিশীল উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্যে কাজ করে থাকে। জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি হ্রাস করে শিশুদের যথাযথ কল্যাণ নিশ্চিত করা এই সংস্থার অন্যতম লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে ১৯৮০-৮৫ সালে দ্বিতীয় কান্ট্রি প্রোগ্রামের আওতায় সরকারকে প্রসূতি ও শিশুস্বাস্থ্য রক্ষা এবং পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি সম্প্রসারণে সমর্থন প্রদান করা হয়। এছাড়া এ সংস্থা বাংলাদেশ সরকারকে নারী ও শিশুদের জন্যে প্রণীত বিভিন্ন নীতিমালা বাস্তবায়নে সহায়তা করে থাকে।

৬) খাদ্য ও কৃষি সংস্থা

এদেশের অধিকাংশ শিশু অপুষ্টির শিকার। আবার জীবিকার অন্বেষণে এ সকল শিশুর অধিকাংশই বিভিন্ন প্রকার শ্রমে নিযুক্ত হয়ে থাকে। খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এদেশের দরিদ্র মহিলা ও অভাবগ্রস্ত লোকদেরকে বিশেষ সমর্থন দানের মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়তা করে থাকে। এতে করে পরোক্ষভাবে শিশুকল্যাণ ত্বরান্বিত হয়। এ সংস্থা ১৯৯২ সালের আন্তর্জাতিক পুষ্টি সম্মেলনের ঘোষণা অনুযায়ী শিশু অপুষ্টি দূরীকরণে বাংলাদেশ সরকারকে সাহায্য করে থাকে।

৭) জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (UNDP)

জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি বিশ্বের বৃহত্তম উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরী সংস্থা। বর্তমানে এটি বিশ্বের ১৫০টি দেশকে সহায়তা প্রদান করে থাকে। ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশে এ সংস্থার কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৯৫-৯৮ সাল পর্যন্ত এ কর্মসূচির আওতায় এদেশে দারিদ্র্য বিমোচন ও শিশু উন্নয়নে ৮৭.২ মিলিয়ন ডলারের বেশি মঞ্জুরী দেওয়া হয়।^{৪১} এ সংস্থাটি কম্যুনিটি ক্ষমতায়ন কর্মসূচির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণে জাতীয় অভিযানকে সফল করার জন্যেও সহায়তা প্রদান করে থাকে। এ কর্মসূচির আওতায় এদেশের প্রায় ৬ লাখ লোককে সেবা প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়। এ কর্মসূচি থেকে সরাসরি উপকার প্রাপ্ত ৯০ হাজার লোকের অধিকাংশই ছিলো শিশু ও মহিলা।^{৪২} বর্তমানে এ সংস্থা দেশের ছিন্নমূল, দুঃস্থ, অসহায় ও পথশিশুদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পুনর্বাসনে 'ARISD' নামক একটি প্রকল্পের আর্থিক ব্যয়ভার বহন করছে। দেশব্যাপী ৯টি বেসরকারি সংগঠন এই প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজে নিয়োজিত রয়েছে। মূলতঃ এ সকল সুবিধাবঞ্চিত শিশুকে মানব সম্পদে রূপান্তরিত করার জন্যে ইউএনডিপি এই প্রকল্প গ্রহণ করেছে।^{৪৩}

৮) কেয়ার-বাংলাদেশ

একটি সমাজকল্যাণ সংস্থা হিসেবে প্রায় সারা বিশ্বে কেয়ারের কার্যক্রম চালু রয়েছে। বিশ্বব্যাপী শিশুকল্যাণে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বর্তমানে এ সংস্থাটি এদেশে শিশুদের সুন্দর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার জন্যে স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা কর্মসূচি, বেসরকারি সংগঠনভিত্তিক পরিবার পরিকল্পনা সেবা কর্মসূচি ও টেকসই উন্নয়নের জন্যে শিশুস্বাস্থ্য কর্মসূচি ইত্যাদি গ্রহণ করেছে। তন্মধ্যে শিশুস্বাস্থ্য কর্মসূচির আওতায় সম্প্রসারিত টিকাদান, ডায়রিয়া নিয়ন্ত্রণ, পরিবার পরিকল্পনা ও ভিটামিন-এ ক্যাপসুল বিতরণ করা হয়।^{৪৪}

৯) আন্তর্জাতিক শিশুকল্যাণ সংস্থা

এটি একটি আন্তর্জাতিক স্বৈচ্ছাসেবী সংস্থা। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে মা ও শিশুদের কল্যাণে সেবা কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনায় সহায়তা প্রদানের জন্যে এ সংস্থা গঠিত হয়। বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে যুদ্ধজনিত পরিস্থিতিতে উদ্বাস্তুদের সহায়তা প্রদান করার পাশাপাশি এদেশের ছিন্নমূল, দুঃস্থ ও এতিম শিশুদের পুনর্বাসনে সংস্থাটি নানাবিধ কর্মসূচী গ্রহণ করে। ১৯৭৩ সালে সমাজকল্যাণ বিভাগের তত্ত্বাবধানে এ সংস্থা ছিন্নমূল, দুঃস্থ ও এতিম শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে পারিবারিক সাহায্য ও পুনর্মিলন কর্মসূচি পরিচালনা করে। এ কর্মসূচির অভিজ্ঞতা নিয়ে পরে এ সংস্থা ১৯৭৪ সালে আর্থিক ও সামাজিক ক্ষতিগ্রস্ত শিশু ও তার পরিবারের জন্যে পরিবার ও শিশুকল্যাণ কর্মসূচি গ্রহণ করে। ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত ১৯টি থানায়, ১৪১টি ইউনিয়নে মোট ৩০৪টি গ্রামে ৫৯২৬৪টি একক পরিবারকে এ কর্মসূচির আওতাভুক্ত করা হয়।^{৪৫} এ সংস্থা বাংলাদেশ সমাজসেবা বিভাগের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে মাঠ পর্যায়ে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে।

১০) বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি

আর্তমানবতার সেবায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির পরিচিতি বিশ্বব্যাপী। ১৮৬৩ সালে সুইজারল্যান্ডের জেনেভা শহরে এটি গড়ে উঠে। বাংলাদেশের শিশুকল্যাণে সংস্থাটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। আন্তর্জাতিক রেডক্রস সমিতির সহায়তায় বাংলাদেশ রেডক্রস সমিতি জরুরী চিকিৎসা কর্মসূচি হিসেবে শিশুদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে থাকে। বর্তমানে এ সমিতি ১০০ জন এতিমের লালন-পালন ও পুনর্বাসনের জন্যে ঢাকায় একটি এতিমখানা পরিচালনা করছে। এটি দেশের অন্যান্য অঞ্চলে আরো ৮টি এতিমখানার মাধ্যমে দুঃস্থ ও অসহায় শিশুদের কল্যাণে কাজ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

১১) সেভ-দ্যা চিলড্রেন এলায়েন্স

১৯৭২ সাল থেকে এ প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের দরিদ্র মানুষের জীবনমান উন্নয়নে সহযোগিতা করছে। অন্যান্য কর্মসূচির পাশাপাশি এ সংস্থা বাংলাদেশে শিশু অধিকার বাস্তবায়নে কর্মরত সেভ-দ্যা-চিলড্রেন নামক ৫টি সংস্থা (রাড্ডা বারনেন, টেরেডাস হোম-নেদারল্যান্ড, টেরেডাস হোম- সুইজারল্যান্ড ইত্যাদি)-র প্রতিনিধিত্ব করছে। এ সংস্থা

শিশুদের জন্যে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও টিকাদান কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এছাড়া শিশুশিক্ষা সম্প্রসারণে এ সংস্থার অধীনে দেশের বিভিন্ন স্থানে ৯টি প্রি-প্রাইমারী স্কুল চালু রয়েছে।^{৪৬}

১২) ওয়ার্ল্ড ভিশন

ওয়ার্ল্ড ভিশন একটি অলাভজনক আন্তর্জাতিক খ্রিস্টিয়ান হিউমেনিটারিয়ান সংগঠন। বর্তমানে এটি বিশ্বের ১০০টির বেশি দেশে প্রায় ৭৫ মিলিয়ন অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্যে বিভিন্ন সেবা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশে এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭২ সালে। তখন এটি মূলতঃ ত্রাণ ও পুনর্বাসনমূলক কাজে নিয়োজিত ছিল। বর্তমানে প্রায় ২৪টি জেলায় শিশুদের জন্যে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি চালু করেছে। ২০০১ সাল পর্যন্ত এ সংস্থা ৯৬,৬৮৪ জন শিশুকে সেবামূলক কাজের জন্যে স্পন্সর করেছে।^{৪৭}

শিশুকল্যাণ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রপঞ্চ। শিশুদের কল্যাণ নিশ্চিত হলে একটি সুন্দর জাতি গঠন করা সম্ভব। এজন্যে প্রয়োজন শিশুদের সুস্থভাবে বেড়ে ওঠার জন্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা। কিন্তু এদেশের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা, অল্পআয় ইত্যাদি নানাবিধ সমস্যার কারণে শিশুদের মৌলিক অধিকারগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না। ফলে, এদেশে মোট শিশুর একটি বিরাট অংশ দুঃস্থ, অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করে থাকে। এ সকল দুঃস্থ, অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুর যথাযথ কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্যে সরকারি ও বেসরকারিভাবে বিভিন্ন সেবা কর্মসূচি চালু রয়েছে। এসব কর্মসূচির পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোও এদেশে শিশুকল্যাণে বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ সংস্থাগুলো এ জাতীয় কার্যক্রমের কখনো উদ্যোক্তা আবার কখনো বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে কাজ করে থাকে। তবে এদেশের দুঃস্থ, অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের তুলনায় এ সকল কার্যক্রম ততটা বিস্তৃত নয়। তদুপরি শিশুকল্যাণে যথাযথ নীতি ও পরিকল্পনার অভাবে পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না। আবার অধিকাংশ কর্মসূচি শহরকেন্দ্রীক হওয়ায় গ্রামীণ এলাকায় শিশুদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ এসব কর্মসূচির সুফল ভোগ করতে পারে না। তাই বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে দুঃস্থ, অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষা, পুনর্বাসন ও কল্যাণে সরকারি-বেসরকারি কার্যক্রমের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর এ জাতীয় কার্যক্রম আরো বিস্তৃত করা প্রয়োজন। এ ছাড়া এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নে টেকসই নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করা আবশ্যিক।

উপসংহার

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার বাস্তব চিত্র জনগণের কল্যাণে সর্বদাই প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করে থাকে। দারিদ্র্যের কারণে এদেশের অধিকাংশ জনগোষ্ঠী মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে পারে না। এদেশের মুষ্টিমেয় জনগণের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ফলে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেলেও বাস্তবে আয় বন্টনে চরম অসমতা বিরাজমান। ফলে অধিকাংশ জনগণ জীবনধারণের জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে পারে না। পাশাপাশি

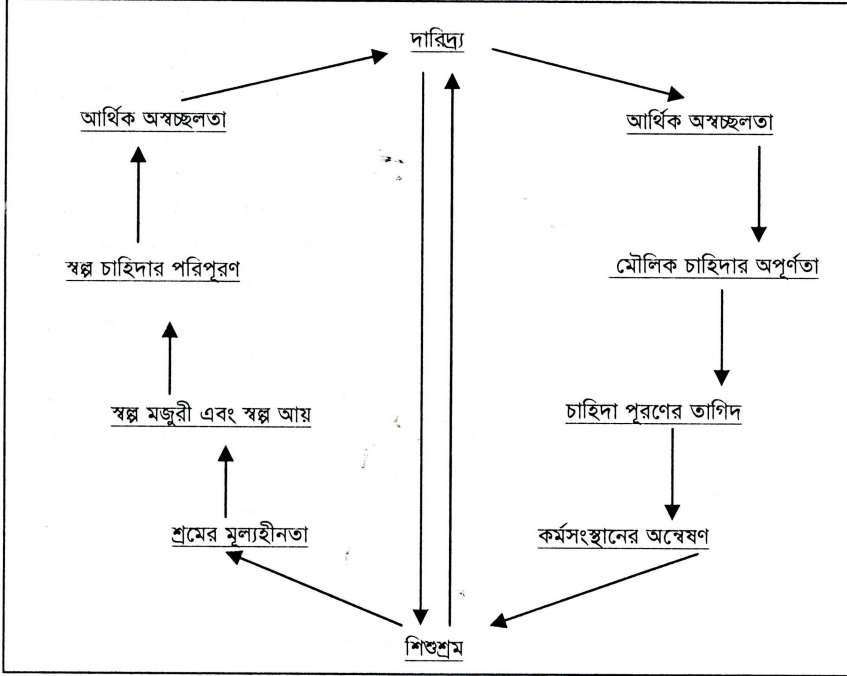
একজন মানুষের বাৎসরিক যাবতীয় চাহিদা মিটানোর জন্যে যে পরিমাণ ভূমি থাকা প্রয়োজন, এদেশের সিংহভাগ জনগণের তা নেই। প্রকৃতপক্ষে ভূমি মালিকানায় চরম অসমতা বিদ্যমান থাকায় স্বল্পসংখ্যক জনগোষ্ঠী এদেশের অধিকাংশ ভূমির মালিকানা দখল করে রয়েছে। ফলে সরকারি হিসাবে মাথাপিছু জমির পরিমাণ স্বল্প মাত্রায় (০.১৮ হেক্টর) নির্দেশিত হলেও এদেশের অধিকাংশ পরিবার বাস্তবে ভূমিহীন। শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে প্রায় একই অবস্থা বিরাজমান। এদেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর প্রায় অর্ধেক নিরক্ষর বা অশিক্ষিত। শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর প্রায় সবাই সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত। বৃত্তিমূলক বা কর্মমুখী শিক্ষা গ্রহণ করেছে এমন জনসংখ্যার হার খুবই কম। আবার কর্মসংস্থানের পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা না থাকায় কর্মক্ষম শিক্ষিত-অশিক্ষিত উভয় জনগোষ্ঠীর একটা বিশাল অংশ বেকার বা কর্মহীন। তদুপরি বিভিন্ন প্রকার শ্রমক্ষেত্রে ছদ্ম ও মৌসুমী বেকারত্ব বিরাজমান থাকায় সার্বিকভাবে এদেশে বেকারত্ব সংকট অনেক তীব্র। এছাড়া দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, কৃষির উপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা, সর্বক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতি ও অপচয়, বাৎসরিক উন্নয়ন কর্মসূচির স্বল্পতা ইত্যাদি কারণে এদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে দ্রুততর করা সম্ভব হয় না।

শৈশবকাল মানব জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এ সময় শিশুরা শিক্ষা-দীক্ষায় সুস্থ সুন্দর জীবন গড়ে তুলবে, দক্ষ, যোগ্য ও সম্ভাবনাময় নাগরিক হিসেবে জাতীয় উন্নয়নে শরীক হবে- এটাই প্রত্যাশা করা হয়। কিন্তু বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতায় ব্যাপক সংখ্যক শিশু জীবন গড়ার এ সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এদেশে মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধাংশ শিশু এবং এদের মধ্যে দরিদ্র, দুঃস্থ, অসহায়, সুবিধাবঞ্চিত, ছিন্নমূল ও পথশিশুদের সংখ্যা সর্বাধিক হওয়া সত্ত্বেও এসব শিশুর জন্যে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে অপরিাপ্ত কর্মসূচির কারণে সকল শিশুর কল্যাণ নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না। এদেশের বিভিন্ন স্থানে চালুকৃত এতিমখানাগুলো মাত্র ৫ শতাংশ শিশুদেরকে দেখাশোনা করতে পারে।^{১০} পাশাপাশি অন্যান্য কিছু কর্মসূচি দ্বারা এতিম, দুঃস্থ, ছিন্নমূল ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের সামান্য অংশকে সেবা প্রদান করা সম্ভব হয়। অধিকাংশ শিশু কোন প্রকার সরকারি ও বেসরকারি সেবা গ্রহণ করতে পারে না। দারিদ্র্যের তাড়নায় এসকল শিশুর অধিকাংশই মৌলিক চাহিদা পূরণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। সুবিধাবঞ্চিত এসব শিশুদের একটা বিরাট অংশ জীবনধারণের তাগিদে বা স্বচ্ছল জীবনযাপনের প্রত্যাশায় শিশুশ্রমের মতো চরম বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিয়ে থাকে। যে বয়সে অন্যান্য সমবয়সী শিশুরা বিদ্যাশিক্ষা, খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদনের মতো গঠনমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে থাকে, সে বয়সে দরিদ্র, অনাথ ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুরা দুবেলা দুমুঠো খেয়ে-পড়ে বাঁচার আশায় কর্মসংস্থানের সন্ধানে পথ-ঘাট, মাঠে-প্রান্তরে ছুটে বেড়ায়। কিন্তু এদেশে পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান বিশেষ করে শিশুদের জন্যে পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার অভাব হেতু এসব শিশু হাতুড়ি, কোদাল, মেশিনের মতো যান্ত্রিক বিশ্বের অমানুষিক শ্রমের সাথে নিজেদের আঁটে-পৃটে বেঁধে রাখে। এ শ্রম যেন তাদের জীবনে নির্মম বাস্তবতা। এভাবে জীবনে ফুল মুকুলিত হবার আগেই কোমলমতি শিশুদের ভবিষ্যৎ জীবনী শক্তি শিশুশ্রমের নির্মম শোষণে ক্রমশ নিঃশেষ হয়ে যায়।

বাংলাদেশে শিশুশ্রম কৌতুকের কোন বিষয় নয়; বৈধতা প্রদান বা সমর্থন করার মতো এজেন্ডা নয়; এদেশেরই প্রতিকূল আর্থ-সামাজিক, ভৌগোলিক অবস্থার বাস্তব প্রতিচ্ছবি মাত্র। যেখানে এদেশের মোট জনগোষ্ঠীর অর্ধাংশেরও বেশি দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে, সেখানে দেশের ও পরিবারের প্রতিকূল আর্থ-সামাজিক অবস্থায় টিকে থাকার জন্যে শিশুরা শ্রমের মতো নিষ্ঠুর বাস্তবতাকে বেছে নিয়ে থাকে। এর ফলে সর্বপ্রকার শ্রমক্ষেত্রে শিশুদের উপস্থিতি ক্রমশ বাড়ছে। এদেশের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, পরিবহন থেকে শুরু করে আর্থ-সামাজিক জীবনের প্রায় সকল স্তরে শিশুশ্রমের ব্যাপক উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করে বর্তমান শিশুসমাজের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশংকায় শংকিত হতে হয়। এ শ্রম তাদের জীবনের সাথে কখনোই মানানসই হয় না। তারপরেও আর্থ-সামাজিক জীবনে একটু স্বচ্ছলতার আশায় তারা এই নির্মম বাস্তবতাকে আলিঙ্গন করে থাকে। শিক্ষা-দীক্ষায়, মেধা-মননে নিজেদেরকে বিকশিত করার সম্ভাবনাটুকু অকাতরে বিসর্জন দিয়ে শরীরের সাথে প্রায় অসহনীয় শ্রমের বিনিময়ে অর্জিত আয়কে তারা হাসিমুখে স্বাগত জানায়। অনেক ক্ষেত্রে শিশুদের এই কাজই হয়ে থাকে তার পরিবারের বাঁচার একমাত্র অবলম্বন। যদিও এ শ্রমে নিয়োজিত হওয়া শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের জন্যে হয়ে উঠে অভিশাপ, তবুও পরিবারের জন্যে তা হচ্ছে জীবনকে বাঁচিয়ে রাখার মতো একটু পাথের স্বরূপ। এদের কর্মক্ষেত্রগুলো কখনো স্থায়ী হয় না। কর্মসংস্থানের আশায় এরা কখনো গ্রাম থেকে শহরে আসে। আবার কখনো গ্রামে থেকেই কঠোর পরিশ্রম করে থাকে। বিদ্যাশিক্ষা, চিত্রবিনোদন, খেলাধুলা, সুষ্ঠু সামাজিকীকরণ এসব শিশুর ভাগ্যে জুটে না। ছন্নছাড়া জীবনে এরা কখনো কখনো মাদকাসক্তি, সন্ত্রাস, ছিনতাই, চুরি, ডাকাতি, চাঁদাবাজির মতো সামাজিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। এর ফলেও সামাজিক সমস্যা দিনে দিনে বাড়ছে বৈ কমছে না।

এদেশে দরিদ্র, দুঃস্থ, অসহায়, ছিন্নমূল ও পথশিশুদের শিক্ষা ও পুনর্বাসনে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ পর্যাপ্ত না হওয়ায় সকল শিশুকে উভয় প্রকার কার্যক্রমের আওতায় এনে শ্রম-বিমুখ করা সম্ভব হচ্ছে না। এদেশে এমন অনেক পরিবার আছে যাদের আয়ের একমাত্র উৎস হচ্ছে শিশু। যদি এসব শিশুকে সরকারি ও বেসরকারি কার্যক্রমের আওতাভুক্ত করা হয়, তাহলে পারিবারিক অঙ্গনে তাদের শ্রম অনুপস্থিতির কারণে আয়ের পথ সংকুচিত হয়ে এ পরিবারগুলো ক্রমশ অস্বচ্ছল হয়ে পড়বে। ফলে দরিদ্র পরিবারগুলো জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলো ঠিকমত পূরণ করতে পারছে না। এতে করে এ পরিবারগুলো দরিদ্র অবস্থা থেকে দরিদ্রতর অবস্থার দিকে ধাবিত হচ্ছে। এভাবে পারিবারিক দারিদ্র্য ও অস্বচ্ছলতা শিশুদেরকে আবার শিশুশ্রমের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এমতাবস্থায় দারিদ্র্য বিমোচন ব্যতীত এদেশে শিশুশ্রম কতটাই হ্রাস করা সম্ভব হবে তা প্রশ্ন সাপেক্ষ ব্যাপার। আবার শিশুশ্রম বন্ধ করা হলে এদেশের কৃষি, ওয়ার্কশপ গার্মেন্টস-এর মতো রপ্তানীমুখী শিল্প কারখানাগুলোতে শ্রমের সংকট দেখা দিচ্ছে কিংবা সেগুলো অচল হয়ে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছে। অন্যদিকে আয়ের পথ সংকুচিত হবার ফলে দুঃস্থ ও অসহায় শিশুদের পরিবার অর্থনৈতিকভাবে বিপন্ন হয়ে পড়ছে যা ক্রমান্বয়ে আরো সমস্যার সৃষ্টি করছে। সুতরাং একথা বলা যেতে পারে যে, বাংলাদেশে দারিদ্র্য, শিশুশ্রম, স্বল্প আয়, স্বল্প

চাহিদাপূরণ, পারিবারিক অস্বচ্ছলতা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত প্রত্যয়। এই আন্তঃসম্পর্কিত প্রত্যয়গুলোকে শিশুশ্রম দুষ্টচক্র (Vicious circle of child labour) এর মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।



উল্লিখিত চক্রটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, দারিদ্র্যের কারণে এদেশের অধিকাংশ শিশু শ্রমে নিয়োজিত। অপরিণত বয়সে শিশুদের শ্রমমূল্য সাধারণত কম হওয়ায় আয়ের পরিমাণও কম হয়। এই অল্প আয় দিয়ে শিশুর পক্ষে পরিবারের সকল চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয় না। তবে শিশুর এ সাহায্য পরিবারের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। শিশুর এ স্বল্প আয়ে পরিবারের চাহিদা পূরণ না হওয়ায় এসব পরিবার থেকে অস্বচ্ছলতা দূরীভূত হয় না, যা আবার দারিদ্র্য ও শিশুশ্রম বিস্তারে সহায়তা করে থাকে। পক্ষান্তরে, শিশুশ্রম বিলোপ সাধন করা হলে এসব শিশুর পরিবারে উপার্জনশীল ব্যক্তির অভাব হেতু মোট আয় কমে যায়। আবার আয়ের পরিমাণ কম হওয়ায় ব্যয়ের পরিমাণও কমে যায়। ফলে স্বল্প ব্যয় দ্বারা পরিবারের সকল চাহিদা পূরণ না হওয়ায় এসব পরিবারের আর্থ-সামাজিক অস্বচ্ছলতা আরো বেড়ে যায়। এতে করে দরিদ্র পরিবারগুলোতে ভারসাম্যহীনতা দেখা দেয়ায় দারিদ্র্য দূরীভূত হয় না। আবার শ্রমবহির্ভূত শিশুরা কাজ না পেয়ে জীবিকার প্রয়োজনে নানা প্রকার অপকর্মে জড়িয়ে পড়ে যা আবার সামাজিক সমস্যা সৃষ্টিতে সহায়তা করে থাকে। তাই দেখা যায়, শিশুশ্রম এদেশে একটি কঠিন বাস্তবতা

হিসেবে দেখা দিয়েছে এবং দারিদ্র্য, স্বল্প আয়, স্বল্প ব্যয়, স্বল্প চাহিদাপূরণ, পারিবারিক অস্বচ্ছলতা প্রত্যয়গুলো শিশুশ্রমের সাথে চক্রাকারে আবর্তিত হচ্ছে। ফলে, এদেশে শিশুশ্রম ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এদেশেরই প্রতিকূল আর্থ-সামাজিক অবস্থায় একে সহসা নির্মূল করা সম্ভব হচ্ছে না। তবে এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, একটা স্বাধীন ও সার্বভৌম জাতি হিসেবে টিকে থাকতে হলে আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম- শিশুদেরকে অবশ্যই শিশুশ্রমের বিষাক্ত ছোবল থেকে মুক্ত করা প্রয়োজন। এজন্যে দেশের ব্যাপক দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং দরিদ্র, এতিম, দুঃস্থ, অসহায়, সুবিধাবঞ্চিত ও পথশিশুদের জন্যে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে সুনির্দিষ্ট নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন ব্যাপক ও বহুমুখী কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা আবশ্যিক। আর তাহলেই এদেশ থেকে শিশুশ্রমের মতো নির্মম বাস্তবতাকে মুছে দেয়া সম্ভব হবে এবং সকল শিশুর সমন্বয়ে উন্নত, দক্ষ ও যোগ্য ভবিষ্যত জাতি গড়ে উঠবে যা জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের প্রত্যাশা।

তথ্য নির্দেশিকা

১. Mostafa Hasan & Amina Pervin, Situation of child labour in Sylhet Town, NBCT, Sylhet-1998, p 15
২. বিশ্ব শিশু পরিস্থিতি, ইউনিসেফ, ২০০১, পৃঃ ২৪
৩. বিশ্ব শিশু পরিস্থিতি, ১৯৯৭, ইউনিসেফ, পৃঃ ৪
৪. M. Abu Taber, "Child Labour in Bangladesh" Social Science Review, University of Dhaka, Vol-IX, December 1992, p 121
৫. M.A Halim, Social Work Legislation in Bangladesh, Dhaka. p 49
৬. বিশ্ব শিশু পরিস্থিতি, ১৯৯৭, ইউনিসেফ, পৃঃ ৫
৭. জাতিসংঘ সংবাদ, মাসিক বুলেটিন, ৫ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ইউনিক, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃঃ ৪
৮. বিশ্ব শিশু পরিস্থিতি, ১৯৯৭, ইউনিসেফ, পৃঃ ৮
৯. পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৯৭-২০০২) পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃঃ ১২
১০. Mostafa Hasan & Amina Pervin. Situation of child labour in Sylhet Town, NBCT, Sylhet-1998, p 15
১১. সৈয়দ শওকতুজ্জামান, সমাজকল্যাণ সমীক্ষণ, ৩য় খন্ড, রোহেল পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০০, পৃষ্ঠা-৩৩০।
১২. Statistical pocket Book 2000, BBS, Planning Commission, Ministry of Planning, Dhaka, p 161.
১৩. মোঃ আব্দুল আলীম, সাধারণ জ্ঞান ও আন্তর্জাতিক ও বাংলাদেশ প্রসংগ, প্রফেসরস প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৯৯, পৃঃ-২৩৭।
১৪. Statistical Year Book of Bangladesh 2000, 21st Edition, Bureau of Statistics, Planning Division, Minisny of Planning, June 2002, Dhaka, p 53, 68
১৫. Dr. Wahidur Rahman, "Situation of Child labour in Bangladesh: A Rapid Assessment" ILO Incollaboration with UNICEF, Dhaka, 1997, p 13-23
১৬. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০২, অর্থবিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয়, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৬২
১৭. প্রাপ্ত, পৃষ্ঠা-৯৭
১৮. Dynamic of rural poverty in Bangladesh, April 1996, BIDS, Dhaka, p 61
১৯. মোঃ জহিরুল ইসলাম শিকদার, কৃষি অর্থনীতি, কনফিডেন্স পাবলিশার্স, ঢাকা ১৯৯৫, পৃঃ ৪৭৯
২০. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০২, প্রাপ্ত, পৃষ্ঠা - ১৩
২১. The Fifth Five Year Plan (1997-2002), Planning Commission, Ministry of Planning, June 1997, Dhaka, p iii-12
২২. The Fifth Five Year Plan (1997-2002), Planning Commission, Ministry of Planning, June 1997, Dhaka, p xxiv-7-23
২৩. মাহবুব-উল-হক, দক্ষিণ এশিয়ার মানব উন্নয়ন, ইউপিএল, ঢাকা, পৃষ্ঠা - ৪০
২৪. The Fifth Five Year Plan (1997-2002), Planning Commission, Ministry of Planning, June 1997, Dhaka, p i-20-21
২৫. তেরেশ ব্রুশে, বাংলাদেশে শিশু অধিকার : হারানো শৈশব ও তার ইতিকথা, ইউ পি এল, ১৯৯৬, ঢাকা, পৃষ্ঠা-২৬৭
২৬. Basic Education For Hard Working Children Manual. People's Republic of Bangladesh, p 11

২৭. স্মরণিকা ১৯৯৯, সমাজসেবা অধিদপ্তর, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃঃ ২২, ৪৭-৫৪
২৮. মাসিক প্রতিবেদন, সমাজসেবা অধিদপ্তর, সিলেট, ২০০১, পৃঃ ৩৯
২৯. সমাজসেবা স্মরণিকা ১৯৯৯, সমাজসেবা অধিদপ্তর, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃঃ ৪৭-৫৪
৩০. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরিপ, ১৯৯২-৯৩, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৩১. The year 2000 Assessment Report, primary and Mass Education Centre, Dhaka, 2001, p 57
৩২. Creating Miracles For The Working Children, UCEP, Dhaka, 2001, p 21-33
৩৩. বাৎসরিক প্রতিবেদন ২০০০, বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম, ঢাকা, পৃঃ ১
৩৪. বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০০, অপরাজেয় বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০০, পৃঃ ১-৩৬
৩৫. প্রতিবেদন ২০০০, কৈশোর বাংলাদেশ, এন বি সি টি, সিলেট, পৃঃ ২-৬
৩৬. Report 1999, BRAC, Dhaka, 2000, p 1-45
৩৭. সমাজসেবা স্মরণিকা ১৯৯৯, সমাজসেবা অধিদপ্তর, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা, পৃঃ ৬৮-৭১
৩৮. সমাজসেবা স্মরণিকা ১৯৯৯, সমাজসেবা অধিদপ্তর, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ১৯৯৯
৩৯. বিশ্ব শিশু পরিস্থিতি, ১৯৯৮, ইউনিসেফ, পৃঃ ৪৫
৪০. সৈয়দ শওকতুজ্জামান, সমাজকল্যাণ সমীক্ষণ, তয় খণ্ড, রোহেল পাবলিকেশন্স, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৬৭২।
৪১. Human Development Report 1997, Oxford University press, UNDP, p 87
৪২. Ibid, p 87
৪৩. স্মরণিকা ১৯৯৯, সমাজসেবা অধিদপ্তর, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃঃ ৪৮
৪৪. স্মরণিকা ১৯৯৯, প্রাপ্ত, পৃঃ ৪৮-৪৯
৪৫. সৈয়দ শওকতুজ্জামান, প্রাপ্ত, পৃঃ ৭০৩
৪৬. বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০১, সেভ দ্যা চিলড্রেন, ঢাকা।
৪৭. বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০১, ওয়ার্ল্ড ভিশন, ঢাকা।